عمران بن مسلم عن ابی الجوزاء قال نزل علی عبد الله بن عمرو بن العاص فذکر الحدیث وخالفه فی رفعه الی النبی صلی الله علیه وسلم ولم یذکر التسبیحات فی ابتداء القراءة انما ذکرها بعدها ثم ذکر جلسة الاستراحة کما ذکرها سائر الرواة اه قلت حدیث ابی الجناب مذکور فی السنن علی هذا الطریق طریق ابن المبارک وماذکر من کلام البیهقی لیس فی السنن بهذا اللفظ فلعله ذکره فی الدعوات الکبیر وما فی السنن انه ذکر اولاحدیث ابی جناب تعلیقا مرفوعا ثم قال قال ابوداؤد رواه روح ابن المسیب وجعفر بن سلیمان عن عمرو بن مالک النکری عن ابی الجوزاء عن ابن عباس قوله وقال فی حدیث روح فقال حدیث النبی صلی الله علیه وسلم اه وظاهر ان الاختلاف فی السند فقط لا فی لفظ الحدیث وذکر شارح الاقناع من فروع الشافعیة صلوة التسبیح واقتصر علی صفة ابن المبارک فقط قال البجیرمی هذه روایة ابن مسعود والذی علیه مشائخنا انه لایسبح قبل القراءة بل بعدها خمسة عشر والعشرة فی جلسة الاستراحة وهذه روایة ابن عباس اه مختصرًا وعلم منه ان طریق ابن المبارک مروی عن ابن مسعود ایضًا لکن لم اجد حدیث ابن مسعود فیما عندی من الکتب بل المذکور فیها علی ما بسطه صاحب المنهل وشارح الاحیاء وغیرهما ان حدیث صلوٰة التسبیح مروی عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله والفضل ابنا العباس وابوهما عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وابورافع مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلی بن ابی طالب واخوه جعفر بن ابی طالب وابنه عبد الله بن جعفر وام المؤمنین ام سلمة والانصاری غیر مسمی وقد قیل انه جابر بن عبد الله قال له الزبیدی وبسط فی تخریج احادیثهم وعلم مما سبق ان حدیث صلوة التسبیح مروی بطرق کثیرة وقد افرط ابن الجوزی ومن تبعه فی ذکره فی الموضوعات ولذا تعقب علیه غیر واحد من ائمة الحدیث کالحافظ ابن حجر والسیوطی والزرکشی قال ابن المدینی قد اساء ابن الجوزی بذکره ایاه فی الموضوعات کذا فی اللآلی قال الحافظ وممن صححه اوحسنه ابن منده والف فیه کتابا والاجری والخطیب وابوسعد السمعانی وابو

موسی المدینی وابوالحسن بن المفضل والمنذری وابن الصلاح والنووی فی تهذیب الاسماء والسبکی وآخرون کذا فی الاتحاف وفی المرقاة عن ابن حجر صححه الحاکم وابن خزیمة وحسنه جماعة اه قلت وبسط السیوطی فی اللآلی فی تحسینه وحکی عن ابی منصور الدیلمی صلوٰة التسبیح اشهر الصلوٰة واصحها اسنادًا.

(৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) ও অন্যান্য বহু ওলামায়ে কেরাম হইতে এই নামাযের ফযীলত নকল করা হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট হইতে এই তরীকা বর্ণিত হইয়াছে ঃ ছানা পড়ার পর ১৫ বার এই কালেমাগুলি পড়িবে। অতঃপর আউযুবিল্লাহ–বিসমিল্লাহ, আল–হামদু সূরা ও অন্য কোন সূরা মিলানোর পর রুকূতে যাওয়ার আগে ১০ বার পড়িবে। অতঃপর রুকূতে ১০ বার পড়িবে। রুকূ হইতে উঠিয়া ১০ বার পড়িবে। দুই সেজদায় ১০ বার ১০ বার করিয়া পড়িবে। দুই সেজদার মাঝখানে বসিয়া ১০ বার পড়িবে। এইভাবে ৭৫ বার হইয়া গেল। (কাজেই দ্বিতীয় সেজদার পর বসিয়া ১০ বার পড়ার প্রয়োজন রহিল না।) রুকূতে যাইয়া প্রথমে সোবহানা রাব্বিয়াল আজিম এবং সেজদায় যাইয়া প্রথমে সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়িবে। উহার পর উক্ত কালেমাগুলি পড়িবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও এই নিয়মে বর্ণনা করা হইয়াছে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ১. সালাতুত–তসবীহ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ নামায। উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা ইহার অনুমান হইতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ স্নেহ–মহব্বত ও গুরুত্বের সহিত ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। উম্মতের ওলামায়ে কেরাম, মোহাদ্দেসীনে কেরাম, ফোকাহায়ে কেরাম ও সূফীয়ায়ে কেরামগণ যুগে যুগে গুরুত্ব সহকারে ইহার উপর আমল করিয়া আসিতেছেন। হাদীসের ইমাম হযরত হাকেম (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইহাও একটি প্রমাণ যে, তাবে–তাবেয়ীনের জমানা হইতে আমাদের জমানা পর্যন্ত অনুসরণীয় বড় বড় হযরতগণ নিয়মিত এই নামায পড়িয়া আসিতেছেন এবং ইহার তালীম দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকও রহিয়াছেন। যিনি ইমাম বোখারী (রহঃ)–এর উস্তাদগণের উস্তাদ। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকেরও আগে ছিলেন হযরত আবুল জাওযা (রহঃ)। যিনি নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী ছিলেন। তিনিও ইহার উপর নিয়মিত আমল করিতেন। প্রতিদিন জোহর নামাযের আজানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মসজিদে যাইতেন আর জামাতের ওয়াক্ত

হওয়া পর্যন্ত ইহাকে পড়িয়া লইতেন। আবদুল আজীজ ইবনে আবী রাওয়াদ (রহঃ) ইনি আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকেরও উস্তাদ ছিলেন। বড় এবাদত-গুজার দুনিয়াত্যাগী ও মোত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাইতে চায় সে যেন অবশ্যই সালাতুত-তসবীহকে মজবুত করিয়া ধরে। আবু ওসমান হীরি (রহঃ) বড় দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি মসীবত ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণের জন্য সালাতুত-তসবীহের মত ফলদায়ক আর কিছু দেখি নাই। আল্লামা তকী সুবকী (রহঃ) বলেন, এই নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কিছুসংখ্যক লোক ইহাকে স্বীকার করে না বলিয়া ধোকায় পড়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি এই নামাযের সওয়াবের কথা শুনিয়াও অবহেলা করে সে দ্বীনের ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শনকারী এবং নেক লোকদের আমল হইতে দূরে। তাহাকে পাকা লোক মনে করা চাই না। 'মেরকাত' কিতাবে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রত্যেক জুমার দিনে এই নামায পড়িতেন।

ফায়দা ঃ ২. কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসকে এইজন্য অস্বীকার করিয়াছেন যে, মাত্র চার রাকাত নামাযে এত বেশী সওয়াব হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ কবীরা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়া। কিন্তু যেহেতু এই হাদীস বহু সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে কাজেই অস্বীকার করাও অসম্ভব। অবশ্য অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের কারণে কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার শর্ত থাকিবে।

ফায়দা ঃ ৩. উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহে নামাযের দুইটি নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি হইল, নামাযে দাঁড়াইয়া আল-হামদু ও সূরা পড়ার পর ১৫ বার উক্ত তসবীহ পড়িবে। অতঃপর রুকূতে যাইয়া 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়ার পর ১০ বার পড়িবে। অতঃপর রুকূ হইতে দাঁড়াইয়া সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা লাকাল হামদ বলার পর ১০ বার তসবীহ পড়িবে। অতঃপর দুই সেজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়ার পর ১০ বার ১০ বার করিয়া পড়িবে। দুই সেজদার মাঝখানে যখন বসিবে তখনও ১০ বার পড়িবে। যখন দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবে তখন আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিবে কিন্তু না দাঁড়াইয়া বসিয়া ১০ বার পড়িবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার না বলিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। দ্বিতীয় রাকাতের পর এমনিভাবে চতুর্থ রাকাতের পর তসবীহগুলিকে ১০ বার ১০ বার পড়িয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে।

দ্বিতীয় নিয়ম হইল, ছানা পড়ার পর আল-হামদু পড়ার পূর্বে ১৫ বার পড়িবে। অতঃপর আল-হামদু ও সূরা মিলানোর পর ১০ বার পড়িবে।

অতঃপর বাকী নামায পূর্বের নিয়মে পড়িবে। অবশ্য এই নিয়মে দ্বিতীয় সেজদার পর বসিতে হইবে না এবং আত্তাহিয়্যাতুর সহিত পড়িতে হইবে না। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, উত্তম হইল কখনও এই নিয়মে পড়া আবার কখনও ঐ নিয়মে পড়া।

ফায়দা ঃ ৪. যেহেতু এই নামায সাধারণভাবে প্রচলিত নয়, কাজেই এ সম্পর্কিত কিছু মাসায়েল লিখিয়া দেওয়া হইতেছে, যাহাতে ইহা আদায়কারীদের জন্য সহজ হয় ঃ

মাসআলা-১ ঃ এই নামাযের জন্য কুরআনের কোন সূরা নির্ধারিত নাই। যে কোন সূরা ইচ্ছা পড়া যায়। তবে কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা ছফ, সূরা জুমুআ, সূরা তাগাবুন এই সূরাগুলি হইতে যে কোন চার সূরা দ্বারা পড়িবে। কোন কোন হাদীসে বিশ আয়াত পরিমাণ পড়ার কথা আসিয়াছে। এইজন্য এমন সূরা পড়া চাই যেইগুলিতে বিশ আয়াতের কাছাকাছি থাকে। কেহ কেহ সূরা যিলযাল, আদিয়াত, তাকাছুর, ওয়াল আছর, কাফিরূন, নাছর, ইখলাছ এইগুলি হইতে যে কোন চারটি দ্বারা পড়িতে বলিয়াছেন।

মাসআলা-২ ঃ এই তসবীহগুলিকে মুখে কখনও গণনা করিবে না, কেননা ইহাতে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অঙ্গুলি বন্ধ করিয়া গণনা করা এবং হাতে তসবীহ লইয়া গণনা করা যদিও জায়েয, তবে মকরূহ। উত্তম হইল, অঙ্গুলিসমূহ যেভাবে নিজ নিজ স্থানে থাকে সেইভাবেই রাখিয়া এক এক তসবীহ পড়িয়া এক এক অঙ্গুলি ঐ স্থানেই একটু চাপাইতে থাকিবে।

মাসআলা-৩ ঃ যদি কোন জায়গায় তসবীহ পড়া ভুলিয়া যাওয়া হয়, তবে উহা পরবর্তী রোকনের মধ্যে আদায় করিয়া নিবে। তবে ভুলিয়া যাওয়া তাসবীহের কাজা রুকূ হইতে উঠিয়া বা দুই সেজদার মাঝখানে আদায় করিবে না। এমনিভাবে প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর বসিলে ঐ সময় ছুটিয়া যাওয়া তসবীহ আদায় করিবে না। বরং শুধু উহারই তসবীহ পড়িবে। ছুটিয়া যাওয়া তসবীহ উহাদের পরবর্তী রোকনে পড়িবে। যেমন রুকূতে পড়া ভুলিয়া গেলে প্রথম সেজদায় পড়িয়া লইবে। এমনিভাবে প্রথহ সেজদায় ভুলিয়া যাওয়া তাসবীহ দ্বিতীয় সেজদায় পড়িবে। আর দ্বিতীয় সেজদায় ভুলিয়া গেলে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়াইয়া পড়িয়া লইবে। তারপরও যদি থাকিয়া যায় তবে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর আগে পড়িয়া লইবে।

মাসআলা-৪ ঃ যদি কোন কারণে সাহু সেজদা করিতে হয় তবে উহাতে এই সমস্ত তসবীহ না পড়া চাই। কেননা, ইহার নির্ধারিত পরিমাণ

তিনশতবার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাঁ, যদি কোন কারণে এই সংখ্যা পূর্ণ না হইয়া থাকে তবে সাহু সেজদার মধ্যে পড়িয়া নিবে।

মাসআলা-৫ ঃ কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে, আত্তাহিয়্যাতুর পর সালামের আগে এই দোয়া পড়িবে ঃ (رواه ابو نعيم فى الحلية من حديث ابن عباس و لفظه اذا فرغت قلت بعد التشهد قبل التسليم اللهم الخ كذا فى الاتحاف و قال اورده الطبر انى ايضا من حديث العباس و فى سنده متروك اه قلت زاد فى المرقاة فى اخر الدعاء بعض الالفاظ بعد قوله خالق النورزد تها تكميلا للفائدة)

দোয়াটি এই—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ
الْهُدٰى وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْيَقِيْنِ وَ
مُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ
اَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ اَهْلِ الْخَشْيَةِ
وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ
وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰى اَخَافَكَ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِىْ
بِهَا عَنْ مَّعَاصِيْكَ وَحَتّٰى اَعْمَلَ
بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ
رِضَاكَ وَحَتّٰى اُنَاصِحَكَ فِى
التَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ وَحَتّٰى
اُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حُبًّا لَّكَ
وَحَتّٰى اَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِى الْاُمُوْرِ
حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ
رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اے اللہ میں آپ سے ہدایت والوں کی
سی توفیق مانگتا ہوں اور یقین والوں کے
عمل اور توبہ والوں کا خلوص مانگتا ہوں
اور صابرین کی پختگی اور آپ سے ڈرنے
والوں کی سی کوشش (یا احتیاط) مانگتا ہوں
اور رغبت والوں کی سی طلب اور پرہیزگاروں
کی سی عبادت اور علماء کی سی معرفت تاکہ
میں آپ سے ڈرنے لگوں اے اللہ ایسا
ڈر جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے
اور تاکہ میں آپ کی اطاعت سے ایسے
عمل کرنے لگوں جن کی وجہ سے آپ کی
رضا اور خوشنودی کا مستحق بن جاؤں اور
تاکہ خلوص کی توبہ آپ کے ڈر سے کرنے
لگوں اور تاکہ سچا اخلاص آپ کی محبت
کی وجہ سے کرنے لگوں اور تاکہ آپ کے
ساتھ حسن ظن کی وجہ سے آپ پر توکل کرنے
لگوں۔ اے نور کے پیدا کرنے والے !

تیری ذات پاک ہے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور تو ہماری مغفرت
فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے درخواست کو قبول فرما۔

"হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি হেদায়েতপ্রাপ্তদের তাওফীক চাহিতেছি এবং একীনওয়ালাদের আমল ও তওবাকারীদের এখলাস চাহিতেছি। আর ছবরকারীদের মজবুতী ও ভয় করনেওয়ালাদের ন্যায় চেষ্টা (অথবা সাবধানতা) চাহিতেছি। এবং অনুরাগীদের মত উৎসাহ, পরহেজগার লোকদের মত এবাদত, ওলামায়ে কেরামের মত আপনার মারেফত চাহিতেছি। যাহাতে আমি আপনাকে ভয় করিতে থাকি। হে আল্লাহ! এমন ভয় যাহা আমাকে আপনার নাফরমানী হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং যাহাতে আমি আপনার হুকুম মানিয়া এমনভাবে আমল করিতে থাকি যাহার ফলে আপনার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দীর উপযুক্ত হইয়া যাই। এবং যাহাতে আপনার ভয়ে খাঁটি তওবা করিতে থাকি। আর যাহাতে আপনার মহব্বতের কারণে সত্যিকার এখলাস প্রকাশ করিতে পারি। আর আপনার প্রতি ভাল ধারণার কারণে আপনার উপর তাওয়াক্কুল করিতে থাকি। হে নূর পয়দাকরণেওয়ালা! আপনার সত্তা পবিত্র। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে পরিপূর্ণ নূর দান করুন। আপনি আমাদেরকে মাফ করিয়া দিন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আরহামুর রাহেমীন! দয়া করিয়া আপনি আমাদের দরখাস্ত কবুল করিয়া নিন। (শরহে এহয়া ঃ তাবারানী)

মাসআলা-৬ ঃ এই নামায মকরূহ ওয়াক্তগুলি ছাড়া দিনে-রাত্রে যে কোন সময় পড়া যায়। অবশ্য সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর পড়া বেশী ভাল। অতঃপর দিনে যে কোন সময়ে তারপর রাত্রিতে পড়া উত্তম।

মাসআলা-৭ ঃ কোন কোন হাদীসে কালেমা সুওমের সহিত লা-হাওলাও উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন উপরে ৩নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে যদি কখনও কখনও ইহাকে যোগ করিয়া লওয়া হয় তবে উত্তম।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

যাকারিয়া কান্ধলভী

জুমার রাত্রি, ২৬শে শাওয়াল ঃ ১৩৫৮ হিঃ

সূচীপত্র
হেকায়াতে সাহাবা

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

নামাযের প্রতি শওক ও আগ্রহ এবং উহাতে খুশু-খজু

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মত্যাগ, সহানুভূতি ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

সপ্তম অধ্যায়

বীরত্ব, সাহসিকতা ও মৃত্যুর আগ্রহ

অষ্টম অধ্যায়

এলেমের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও একাগ্রতা

নবম অধ্যায়

হুযূর (সাঃ)এর আনুগত্য ও হুকুম তামিল করা এবং হুযূর (সাঃ)এর মনোভাব কি তাহা লক্ষ্য করা

দশম অধ্যায়

মহিলাদের দ্বীনি জয্‌বা

জ্ঞাতব্য বিষয়

হুযূর (সঃ)এর বিবিগণ ও সন্তানগণ

হুযূর (সঃ)এর সন্তান–সন্ততি

একাদশ অধ্যায়

বাচ্চাদের দ্বীনি জয্‌বা

দ্বাদশ অধ্যায়

হুযূর (সঃ)এর প্রতি ভালবাসার নমুনা

॥॥॥



نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهِ الْحُمَاةِ لِلدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালার এক মকবূল বান্দা, আমার মুরুব্বী ও আমার উপর এহসানকারী (হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহঃ) হিজরী ১৩৫৩ সালে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর কিছু কাহিনী বিশেষ করিয়া অল্পবয়স্ক সাহাবীগণ ও মহিলা সাহাবিয়াগণের দ্বীনদারী ও দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদের উৎসাহ–উদ্দীপনা সম্পর্কিত কিছু ঘটনা উর্দূ ভাষায় লিখিবার জন্য আমাকে হুকুম করেন। যে সমস্ত লোক কিসসা–কাহিনীর প্রতি আগ্রহী তাহারা যেন বেহুদা মিথ্যা কাহিনীর পরিবর্তে এই সমস্ত সত্য ঘটনা পড়িতে পারে, যাহাতে তাহাদের দ্বীন ও ঈমানের তরক্কী হয়। ঘরের মহিলাগণও রাত্রে বাচ্চাদেরকে মিথ্যা কাহিনী না শুনাইয়া এইগুলি শুনাইতে পারে। যাহাতে বাচ্চাদের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি–শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনি বিষয়ের প্রতি শওক ও জযবা পয়দা হয়। এই আদেশ পালন করা আমার জন্য খুবই জরুরী ছিল। কেননা, আমি তাঁহার এহসানসমূহে ডুবিয়া রহিয়াছি। এ ছাড়া আল্লাহওয়ালাদের সন্তুষ্টি দো জাহানের কামিয়াবীর ওসীলা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমার সম্বলহীনতার কারণে এই কাজ তাঁহার মর্জি মোতাবেক আঞ্জাম দিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারি নাই। এইজন্য চার বৎসর পর্যন্ত বারবার কেবল তাঁহার হুকুম শুনিতে থাকি আর আমার অযোগ্যতার কারণে লজ্জিত হইতে থাকি। এই সময় হিজরী ১৩৫৭ সালের

সফর মাসে একটি অসুখের কারণে আমাকে দেমাগী কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। তখন আমার খেয়াল হইল, এই অবসর দিনগুলিকে এই বরকতপূর্ণ কাজে ব্যয় করিয়া দেই। যদি আমার লেখা পৃষ্ঠাগুলি তাঁহার পছন্দ না হয়, তবুও আমার এই অবসর সময়টুকু তো উত্তম ও বরকতপূর্ণ কাজে কাটিয়াই যাইবে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আল্লাহওয়ালাদের ঘটনাবলী ও জীবন বৃত্তান্ত এমন একটি বিষয় যাহা অবশ্যই অনুসন্ধান করিয়া জানা এবং উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করিয়া সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় হাবীব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁহারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণের উপযুক্ত। ইহা ছাড়া আল্লাহওয়ালাদের আলোচনা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হয়। সূফীকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ঘটনা ও কাহিনী হইল আল্লাহ তায়ালার একটি বাহিনী। ইহা দ্বারা মুরীদগণের অন্তর শক্তিশালী হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কোন দলীলও আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِىْ
هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থ ঃ আর আমি পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলী হইতে এইসব ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি ; যাহা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করি। (ইহা একটি উপকার, দ্বিতীয় উপকার হইল,) এই সমস্ত ঘটনা বলিতে এমন এমন বিষয়বস্তু আপনার নিকট পৌঁছিয়া থাকে যাহা সত্য ও বাস্তব এবং মুসলমানদের জন্য বিরাট উপদেশ এবং (নেক আমল করার জন্য) স্মারক বাণী। (বয়ানুল কুরআন)

একটি জরুরী বিষয়—ইহাও অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া লওয়া উচিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ, বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী, দ্বীনি মাসায়েলের কিতাবসমূহ কিংবা নির্ভরযোগ্য লোকদের ওয়াজ–নসীহত একবার পড়িয়াই সব সময়ের জন্য উহা বাদ দিয়া দেওয়ার বিষয় নয়। বরং নিজের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুসারে বার বার পড়িতে থাকা উচিত। আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ) এক বুযুর্গ ছিলেন, তিনি বলেন, আমি এক ওয়াজকারীর মজলিসে হাজির হইলাম। তাঁহার ওয়াজ আমার দিলে আছর করিল ; কিন্তু ওয়াজ শেষ হইবার পরই সেই আছর

খতম হইয়া গেল। দ্বিতীয় বার তাঁহার মজলিসে হাজির হইলাম। এইবার ওয়াজ শেষ হইবার পর বাড়ী যাওয়ার পথেও উহার আছর বাকী রহিল। পুনরায় তৃতীয়বার যখন হাজির হইলাম, তখন উহার আছর বাড়ী পৌঁছিবার পরও বাকী রহিল। ঘরে ঢুকিয়া আমি আল্লাহর নাফরমানীর যাবতীয় জিনিসপত্র সব ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং আল্লাহর পথ গ্রহণ করিয়া লইলাম। দ্বীনি কিতাবাদির অবস্থাও তদ্রূপ ; ভাসাভাসা একবার মাত্র পড়িয়া নিলে আছর কম হয়। এইজন্য নিয়মিত মাঝে মাঝে এইসব কিতাব পড়িতে থাকা উচিত। পাঠকদের সুবিধা এবং বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হওয়ার জন্য আমি কিতাবটিকে বারটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে ভাগ করিয়াছি ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ দ্বীনের খাতিরে নির্যাতন সহ্য করা ও দুঃখ–কষ্ট ভোগ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আল্লাহকে ভয় করা যাহা সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও গরিবানা জিন্দেগীর নমুনা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া ও পরহেজগারীর অবস্থা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নামাযের প্রতি আগ্রহ ও উহার এহতেমাম।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ হাম্‌দরদী, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা।

সপ্তম অধ্যায় ঃ বাহাদুরী ও বীরত্ব, হিম্মত ও সাহসিকতা এবং মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা।

অষ্টম অধ্যায় ঃ জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ততা ও জ্ঞানচর্চায় মনোযোগের নমুনা।

নবম অধ্যায় ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম পালন।

দশম অধ্যায় ঃ স্ত্রীলোকদের দ্বীনি জযবা ও বীরত্ব এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ ও সন্তান–সন্ততির বর্ণনা।

একাদশ অধ্যায় ঃ বাচ্চাদের দ্বীনি জযবা এবং শৈশবে দ্বীনের এহতেমাম।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বতের নমুনা।

পরিশিষ্ট ঃ সাহাবায়ে কেরামের হক ও অধিকার এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ফাযায়েল।

হেকায়াতে সাহাবা

প্রথম অধ্যায়

দ্বীনের খাতিরে নির্যাতন সহ্য করা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) দ্বীন-প্রচারের জন্য যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, উহা সহ্য করা তো দূরের কথা ঐরূপ ইচ্ছা পোষণ করাও আমাদের মত নালায়েকদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। ইতিহাসের কিতাবসমূহ এইসব ঘটনার বিবরণে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করা তো স্বতন্ত্র কথা সেইসব ঘটনা জানার জন্যও আমরা কষ্ট স্বীকার করি না। এই অধ্যায়ে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইতেছে। সর্বপ্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের একটি ঘটনা দ্বারা শুরু করিতেছি। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা বরকতের ওসীলা হইয়া থাকে।

(১) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফরের ঘটনা

নবুওত পাওয়ার পর নয় বৎসর পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মোকাররমায় তবলীগ করিতে থাকেন এবং কওমের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন আর কিছু সংখ্যক লোক যাহারা মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য করিতেছিলেন, তাহারা ছাড়া মক্কার অধিকাংশ কাফের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণকে সর্বপ্রকারে কষ্ট দিতেছিল। তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত এবং যত রকম নির্যাতন সম্ভব উহা করিতে ত্রুটি করিত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব সেই সকল হৃদয়বান লোকদের মধ্যে ছিলেন যাহারা মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করিতেন। নবুওয়তের দশম বৎসর যখন

আবূ তালেবেরও ইন্তেকাল হইয়া গেল, তখন কাফেরদের জন্য সর্বদিক হইতে আরও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে বাধা প্রদান ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সুযোগ মিলিয়া গেল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উদ্দেশ্যে তায়েফ তশরীফ লইয়া গেলেন যে, সেখানে ছকীফ গোত্রের লোকসংখ্যা অনেক ; যদি এই গোত্র মুসলমান হইয়া যায়, তবে মুসলমানরা এই সকল নির্যাতন হইতে নাজাত পাইবে এবং দ্বীন–প্রচারের বুনিয়াদ কায়েম হইয়া যাইবে। সেখানে পৌছিয়া গোত্রের শীর্ষস্থানীয় তিনজন নেতার সহিত কথা বলিলেন, তাহাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহর রাসূলের অর্থাৎ নিজের সাহায্যের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু তাহারা দ্বীনের কথা কবূল করা অথবা কমপক্ষে আরবের প্রসিদ্ধ মেহমানদারীর প্রতি খেয়াল করিয়া একজন নবাগত মেহমানের খাতির–যত্ন করার পরিবর্তে পরিস্কার জবাব দিয়া দিল এবং অত্যন্ত রুক্ষ ও অভদ্র ব্যবহার করিল। তাহারা ইহাও সহ্য করিল না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করিবেন। যাহাদেরকে সর্দার ও ভদ্র মনে করিয়া কথা বলিয়াছিলেন যে, সম্ভবত তাহারা সম্ভ্রান্ত হইবে এবং ভদ্র ভাষায় কথা বলিবে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, ওহ–হো, তোমাকেই আল্লাহ নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন? দ্বিতীয়জন বলিল, আল্লাহ তায়ালা কি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও পান নাই, যাহাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইতেন? তৃতীয় জন বলিল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিব না, কেননা, সত্যই যদি তুমি নবী হইয়া থাক যেমন তুমি দাবী করিতেছ তবে তোমার কথা অমান্য করিলে বিপদ হইবে। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আমি এইরূপ লোকের সঙ্গে কথা বলিতে চাই না।

অতঃপর তাহাদের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য লোকের সহিত কথা বলার ইচ্ছা করিলেন ; কারণ তিনি ছিলেন ধৈর্য ও হিম্মতের পাহাড়। কিন্তু কেহই তাঁহার দাওয়াত কবূল করিল না। বরং কবুল করার পরিবর্তে তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়া দিল, আমাদের শহর ছাড়িয়া এক্ষুণি বাহির হইয়া যাও এবং যেখানে তোমার চাহিদা হয়, সেইখানে চলিয়া যাও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহারা শহরের ছেলেদেরকে তাঁহার পিছনে লেলাইয়া দিল। তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ঠাট্টা–বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তালি

বাজাইতে লাগিল, পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে রক্ত প্রবাহিত হইবার কারণে তাঁহার উভয় জুতা রঞ্জিত হইয়া গেল। এই অবস্থাতেই তিনি ফিরিয়া চলিলেন। পথে এক জায়গায় আসিয়া যখন ঐ দুষ্টদের হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِىْ
وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ
الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ اِلٰى مَنْ
تَكِلُنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِىْ اَمْ اِلٰى
عَدُوٍّ مَلَّكْتَهٗ اَمْرِىْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ
بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِىْ وَلٰكِنْ
عَافِيَتُكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ
وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ
وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
مِنْ اَنْ تُنْزِلَ بِىْ غَضَبَكَ
اَوْيَحِلَّ عَلَىَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبٰى
حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
بِكَ كَذَا فِىْ سِيْرَةِ ابْنِ هَشَام
قلت واختلفت الروايات فى
الفاظ الدعاء كما فى قرة العيون

"اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی
کمزوری اور بےکسی کی اور لوگوں میں ذلت اور
رسوائی کی. اے اَرحَمَ الرَّاحِمِین تو ہی ضعفاء کا
ربّ ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے. تو مجھے
کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانہ کے
جو مجھے دیکھ کر ترش رُو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا
ہے یا کہ کسی دشمن کے جس کو تونے مجھ پر قابو دیدیا.
اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے
کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. تیری حفاظت
مجھے کافی ہے میں تیرے چہرہ کے اُس نور
کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو
گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے
کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے
پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصّہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو
تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے
جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت
ہے نہ قوت.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছেই আমি আমার কমজোরী ও অসহায়ত্ব ও মানুষের মাঝে অপদস্থতার অভিযোগ করিতেছি। ইয়া আরহামার–রাহেমীন! তুমিই দুর্বলদের রব এবং তুমিই আমার রব। আমাকে তুমি কাহার সোপর্দ করিতেছ, কোন্ অপরিচিত পর মানুষের সোপর্দ করিতেছ, যে আমাকে দেখিয়া বিরক্ত হয় ; মুখ বিকৃত করে। নাকি আমাকে এমন কোন দুশমনের সোপর্দ করিতেছ, যাহাকে আমার উপর

ক্ষমতা দিয়াছ। হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না থাক, তবে আমি কাহারও পরওয়া করি না। তোমার হেফাজতই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তোমার চেহারার ঐ নূরের ওসীলায়, যাহা দ্বারা সকল অন্ধকার আলোকিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কাজ দুরুস্ত হইয়া যায়—এই বিষয়ে পানাহ চাহিতেছি যে, আমার প্রতি তোমার আক্রোশ হয় অথবা তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও। তোমার অসন্তুষ্টি দূর করা আমার জন্য জরুরী যতক্ষণ না তুমি সন্তুষ্ট হও। তুমি ছাড়া কোন শক্তি নাই, কোন ক্ষমতা নাই। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

সমস্ত জগতের বাদশাহীর অনন্ত অধিকারী আল্লাহ তায়ালার গজব ও কহরে জোশ আসাটাই স্বাভাবিক ছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজির হইলেন এবং সালাম দিয়া আরজ করিলেন, কওমের সহিত আপনার কথাবার্তা ও তাহাদের জওয়াব আল্লাহ তায়ালা শুনিয়াছেন। পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত এক ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাকে হুকুম করুন। অতঃপর সেই ফেরেশতা সালাম দিয়া আরজ করিল, আপনি যাহা এরশাদ করিবেন আমি তাহাই পালন করিব। যদি বলেন, দুই দিকের পাহাড়গুলিকে মিলাইয়া দিব যাহাতে ইহারা মাঝখানে নিষ্পেষিত হইয়া যায় অথবা যেরূপ শাস্তি দেওয়ার আপনি আদেশ করিবেন তাহা পালন করিব। কিন্তু দয়ালু নবী জওয়াব দিলেন, আল্লাহর কাছে আমি এই আশা রাখি যে, যদি ইহারা মুসলমান নাও হয় তবু ইহাদের সন্তানদের মধ্যে এমন লোক পয়দা হইবে যাহারা আল্লাহর এবাদত করিবে।

ফায়দা ঃ ইহা হইল সেই দয়ালু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান চরিত্র, যাঁহার নামে আমরা আমাদের পরিচয় দিয়া থাকি। কেহ সামান্য গালি দিলে, সামান্য কষ্ট পৌঁছাইলে আমরা এমন উত্তেজিত হইয়া পড়ি যে, সারাজীবনেও উহার প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হয় না ; জুলুমের উপর জুলুম করিতে থাকি। ইহার পরও উম্মতে-মুহাম্মদী ও নবীর অনুসারী হইবার দাবী করি। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত কঠিন অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন বদ-দোয়া করিলেন না এবং কোন প্রতিশোধও নিলেন না।

(২) হযরত আনাস ইবনে নযর (রাযিঃ)-এর শাহাদত

হযরত আনাস ইবনে নযর (রাযিঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই। এইজন্য তাহার মনে খুবই দুঃখ

ছিল। তিনি নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, 'ইসলামের সর্বপ্রথম আজীমুশ্বান যুদ্ধ হইয়া গেল, আর তুমি উহাতে শরীক হইতে পারিলে না!' তাঁহার আকাঙ্খা ছিল, আবার যদি কোন যুদ্ধ হয় তবে মনের বাসনা পূরণ করিব। ঘটনাক্রমে উহুদের যুদ্ধ সামনে আসিয়া গেল। উহাতে তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সহিত অংশগ্রহণ করিলেন। উহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে তো মুসলমানদের বিজয় হইয়াছিল। কিন্তু শেষ দিকে একটি ভুলের কারণে মুসলমানদের পরাজয় ঘটিল। ভুলটি এই ছিল যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে একটি বিশেষ জায়গায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাহাই হউক না কেন, আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা এই জায়গা ত্যাগ করিবে না। কেননা ঐ দিক হইতে দুশমনের হামলার আশঙ্কা ছিল। যখন প্রথম দিকে মুসলমানদের বিজয় হইল এবং কাফেররা পলায়ন করিতে লাগিল তখন তাহারা উক্ত স্থান হইতে সরিয়া গেলেন এবং মনে করিলেন যে, এখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই পলায়নরত কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করা হউক এবং গনীমতের মাল হাসিল করা হউক। দলের সর্দার তাঁহাদিগকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করাইয়া দিয়া এই জায়গা ত্যাগ করিতে নিষেধও করিলেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ তো শুধু যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্য ছিল। অতএব তাঁহারা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের ময়দানে গিয়া পৌঁছিলেন। অপরদিকে পলায়নরত কাফেররা এই স্থান খালি দেখিয়া এ দিক হইতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিল। মুসলমানগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অতর্কিত ও অপ্রস্তুত আক্রমণে তাহারা পরাজয় বরণ করেন। তাঁহারা উভয় দিক হইতে কাফেরদের বেষ্টনীর ভিতরে পড়িয়া যান। এমতাবস্থায় মুসলমানগণ পেরেশান হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) দেখিলেন, সম্মুখ দিক হইতে এক সাহাবী হযরত সাআদ বিন মুআয (রাযিঃ) আসিতেছেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে সাআদ! কোথায় যাইতেছ? আল্লাহর কসম! উহুদ পাহাড় হইতে জান্নাতের খোশবূ আসিতেছে। এই বলিয়া তিনি উন্মুক্ত তরবারী হাতে কাফেরদের ভীড়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত ফিরিলেন না। শাহাদতের পর দেখা গেল দুশমনের অস্ত্রের আঘাতে তাঁহার দেহ চালুনীর মত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শরীরে তীর ও তরবারীর আশিটিরও বেশী আঘাত ছিল। তাঁহার বোন অঙ্গুলীর গিরা দেখিয়া তাঁহাকে

চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ফায়দা ঃ যাঁহারা এখলাস ও সত্যিকার আগ্রহের সহিত আল্লাহর কাজে লাগিয়া যান তাঁহারা দুনিয়াতে জান্নাতের মজা পাইয়া থাকেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) জীবদ্দশায়ই জান্নাতের খোশবূ পাইতেছিলেন। যদি মানুষের মধ্যে এখলাস আসিয়া যায় তবে দুনিয়াতেও তাঁহারা জান্নাতের মজা পাইতে থাকে। আমি হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)এর একজন নির্ভরযোগ্য ও মোখলেছ খাদেমের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'জান্নাতের মজা পাইতেছি।' ফাযায়েলে রমযানের মধ্যে আমি এই ঘটনা লিখিয়াছি।

৩ হুদাইবিয়ার সন্ধি

হযরত আবূ জান্দাল ও হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ)এর ঘটনা

হিজরী ষষ্ঠ সনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা করিবার এরাদায় মক্কা শরীফ যাইতেছিলেন। মক্কার কাফেররা এই সংবাদ জানিয়া ইহাকে নিজেদের জন্য অপমানকর মনে করিল। তাই তাহারা ইহাতে বাধা দিল। ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুদাইবিয়া নামক স্থানে থামিতে হইল। জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সঙ্গে ছিলেন। যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জীবন কুরবান করিয়া দেওয়াকে গৌরব মনে করিতেন। তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের খাতিরে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা শুরু করিলেন। যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর প্রস্তুতি ও বাহাদুরী সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের এত বেশী খাতির করিলেন যে, তাহাদের সকল শর্তই মানিয়া লইলেন। এইরূপ অপমানজনক সন্ধি সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর নিকট অসহনীয় ছিল। কিন্তু তাঁহারা তো ছিলেন জীবন উৎসর্গকারী ও একান্ত বাধ্যগত, কাজেই হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সম্মুখে তাহাদের করার কিছুই ছিল না। এ কারণেই হযরত ওমর (রাযিঃ)এর মত বাহাদুর ব্যক্তিকেও দমিয়া যাইতে হইল। সন্ধির মধ্যে যে সকল শর্ত স্থির হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে, কাফেরদের মধ্য হইতে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলে মুসলমানগণ তাহাকে মক্কায় ফেরত পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে। পক্ষান্তরে খোদা না করুন মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ ইসলাম ত্যাগ

করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। সন্ধিপত্র এখনও পূর্ণ লেখা হয় নাই এমতাবস্থায় হযরত আবু জান্দাল (রাযিঃ) যিনি একজন সাহাবী, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তিনি বিভিন্ন রকম নির্যাতন সহ্য করিতেছিলেন, হাত পা শিকলে বাধা অবস্থায় কোন রকমে মুসলিম বাহিনীর নিকট পৌছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে, হয়ত তাহাদের আশ্রয়ে যাইয়া এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবেন। তাহার পিতা সোহাইল যিনি কাফেরদের পক্ষ হইতে এই সন্ধিপত্রের উকিল ছিলেন এবং পরে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে চড় মারিলেন এবং তাহাকে ফেরত লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এখনও তো সন্ধিপত্র পূর্ণরূপে লিখিতও হয় নাই, সুতরাং এখনই উহার পাবন্দী করা জরুরী হইবে কেন? কিন্তু তাহারা ইহাতে অনড় থাকিল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একজন লোক আমাকে ভিক্ষাই দিয়া দাও। কিন্তু তাহারা জিদ ধরিয়া বসিল এবং কিছুতেই মানিল না। হযরত আবূ জান্দাল (রাযিঃ) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চস্বরে ফরিয়াদও করিলেন যে, আমি মুসলমান হইয়া কি নিদারুণ দুঃখ-যাতনা ভোগ করিয়া এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি ; এখন আমাকে আবার ফেরত পাঠানো হইতেছে! এই সময় মুসলমানদের মানসিক অবস্থা যে কি হইয়াছিল তাহা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবেক তাহাকে ফেরত যাইতে হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ধৈর্য ধারণের নসীহত করিয়া বলিলেন, অতি সত্বর আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য রাস্তা খুলিয়া দিবেন।

সন্ধিপত্র পূর্ণ হইবার পর অপর এক সাহাবী হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ)ও মুসলমান হইয়া মদীনায় গিয়া পৌছিলেন। কাফেরগণ তাঁহাকে ফেরত আনিবার জন্য দুইজন লোক পাঠাইল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা মুতাবিক তাহাকে ফেরৎ দিলেন। আবু বাছীর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হইয়া আসিয়াছি, আপনি আমাকে আবার কাফেরদের কবলে পাঠাইতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকেও ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়া বলিলেন, ইনশাআল্লাহ, অতি সত্বর তোমাদের জন্য রাস্তা খুলিয়া যাইবে।

হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ) দুই কাফেরের সহিত মক্কায় ফিরিয়া

চলিলেন। পথে দুই কাফের দ্বয়ের একজনকে বলিলেন, বন্ধু তোমার তরবারীখানা তো বড়ই চমৎকার মনে হইতেছে! অহংকারী লোক সামান্য কথাতেই ফুলিয়া উঠে। সে তৎক্ষণাৎ খাপ হইতে তরবারী বাহির করিয়া বলিতে লাগিল, হাঁ, ইহা আমি বহু মানুষের উপর পরীক্ষা করিয়াছি। এই কথা বলিয়া সে তরবারীখানা তাঁহার হাতে দিল। তিনি তরবারী হাতে লইয়া তাহারই উপর উহা পরীক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গী ইহা দেখিয়া ভাবিল, একজনকে তো শেষ করিয়াছে এইবার আমার পালা। সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মদীনায় আসিল এবং হুযূর (সাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল যে, আমার সাথী মারা পড়িয়াছে, এইবার আমার পালা। ইতিমধ্যে হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ)ও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ফেরত পাঠাইয়া আপনি আপনার ওয়াদা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সহিত আমার কোন অঙ্গীকার নাই যে, উহা আমাকে পালন করিতে হইবে। ইহারা আমাকে আমার দ্বীন হইতে ফিরাইতে চাহিয়াছে, তাই আমি এইরূপ করিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এ তো দেখিতেছি যুদ্ধ বাধাইয়া দিবে, হায় যদি এই ব্যক্তির কোন সাহায্যকারী হইত! হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ) এই কথার দ্বারা বুঝিয়া গেলেন যে, এখনও যদি কেহ আমাকে নিতে আসে তবে আমাকে আবারও ফেরত পাঠানো হইবে। তাই তিনি মদীনা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র উপকূলের এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মক্কাবাসী এই ঘটনা জানিতে পারিল। হযরত আবূ জান্দাল (রাযিঃ) যাহার ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনিও গোপনে সেখানে পৌছিয়া গেলেন। এইভাবে যে কেহ মুসলমান হইত, সে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইত। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহারা একটি ছোটখাট দলে পরিণত হইয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে না আছে খানাপিনার কোন ব্যবস্থা, না আছে কোন বাগ-বাগিচা, না আছে কোন বসতি। এমতাবস্থায় তাঁহাদের উপর দিয়া যে কি কঠিন অবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

কিন্তু যে সমস্ত জালেমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। এই পথে তাহাদের যে সকল বাণিজ্যিক কাফেলা যাতায়াত করিত তাহাদের সহিত মোকাবেলা ও লড়াই করিতেন। পরিশেষে মক্কার কাফেরগণ কোন উপায় না দেখিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মহান আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়া অত্যন্ত মিনতি সহকারে লোক পাঠাইয়া এই

প্রার্থনা জানাইল যে, তিনি যেন এই উচ্ছৃঙ্খল দলটিকে নিজের নিকট ডাকিয়া নিয়া যান। যাহাতে উহারাও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং আমাদের জন্যও যাতায়াতের রাস্তা খুলিয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিপত্র যখন তাহাদের নিকট পৌছিল তখন হযরত আবূ বাছীর (রাযিঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। হুযূরের পত্রখানি তাঁহার হাতে ছিল এমতাবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করিলেন রাযিয়াল্লাহু আনহু। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ মানুষ যদি তাহার সত্য দ্বীনের উপর মজবুত হয় তবে যত বড় শক্তিই হউক তাহাকে দ্বীন হইতে সরাইতে পারে না। মুসলমান যদি সত্যিকার মুসলমান হয় তবে আল্লাহ পাক তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন বলিয়া ওয়াদা রহিয়াছে।

(৪) হযরত বিলাল হাবশী (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ ও নির্যাতন ভোগ

হযরত বিলাল হাবশী (রাযিঃ) একজন বিখ্যাত সাহাবী। যিনি মসজিদে নববীর স্থায়ী মুআজ্জিন ছিলেন। শুরুতে তিনি একজন কাফেরের গোলাম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁহাকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দেওয়া হইত। উমাইয়া ইবনে খালফ মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল। সে তাহাকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দুপুরের সময় উত্তপ্ত বালুর উপর চিৎ করিয়া শোয়াইয়া একটি ভারি পাথর তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিত। যাহাতে তিনি নড়াচড়া করিতে না পারেন। আর বলিত যে, হয় এই অবস্থায় মরিবে, আর বাঁচিতে চাহিলে ইসলাম ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু হযরত বিলাল (রাযিঃ) এই অবস্থাতেও 'আহাদ আহাদ' বলিতেন অর্থাৎ আমার মাবুদ একমাত্র আল্লাহ। রাত্রে শিকলে বাঁধিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত এবং পরদিন উত্তপ্ত জমিনের উপর শোয়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত শরীরকে আরও বেশী ক্ষত-বিক্ষত করা হইত। যেন তিনি অতিষ্ঠ হইয়া ইসলাম ত্যাগ করেন, নতুবা ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নির্যাতনকারীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িত। কখনও আবূ জাহল কখনও উমাইয়া ইবনে খালফ কখনও বা অন্য কেহ পালাক্রমে শাস্তি দিত। প্রত্যেকে শাস্তি দিতে নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ব্যয় করিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিলেন।

ফায়দা ঃ যেহেতু আরবের মূর্তিপূজকগণ নিজেদের মূর্তিগুলিকেও মাবুদ বা উপাস্য বলিয়া মনে করিত, তাই উহার মুকাবিলায় ইসলামের

শিক্ষা ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদের। এই কারণেই হযরত বিলাল (রাযিঃ)এর মুখে শুধু একত্ববাদেরই যিকির ছিল। ইহা প্রেম ও ভালবাসার বিষয়। আমরা যেখানে মিথ্যা মহব্বতের বেলায় দেখিতে পাই যে, যাহার সহিত মহব্বত হইয়া যায় তাহার নাম উচ্চারণ করিতে মজা লাগে। অনর্থক উহাকে বারবার উচ্চারণ করা হয়। সেখানে আল্লাহ পাকের মহব্বত ও ভালবাসার ব্যাপারে আর কি বলিব, যাহা দ্বীন দুনিয়া উভয় স্থানে কাজে আসিবে। এই কারণেই যখন হযরত বিলাল (রাযিঃ)কে সর্বপ্রকারে নির্যাতন করা হইত, কঠিন হইতে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত, মক্কার বালকদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত আর তাহারা তাহাকে অলিতে গলিতে ঘুরাইতে থাকিত তখন তাঁহার জবানে শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' জপ উচ্চারিত হইতে থাকিত।

ইহারই প্রতিদানস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তিনি মুআজ্জিন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মদীনায় ও সফরে সর্বাবস্থায় আজান দেওয়ার দায়িত্ব তাহাকে দেওয়া হয়। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মদীনা শরীফে বসবাস করা ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান শূন্য দেখা তাহার জন্য কষ্টকর হইয়া গেল। এইজন্য তিনি অবশিষ্ট জীবন জেহাদে কাটাইয়া দেওয়ার মনস্থ করিলেন। সুতরাং জেহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি চলিয়া গেলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি আর মদীনা মোনাওয়ারায় ফিরিয়া আসেন নাই। একদিন তিনি স্বপ্নযোগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, বিলাল! ইহা কেমন জুলুমের কথা যে, আমার নিকট একেবারেই আসিতেছ না। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় হাজির হইলেন। হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাযিঃ) তাহাকে আযান দেওয়ার অনুরোধ করিলেন। আদরের দুলালদের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। আযান দিতে আরম্ভ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার আযানের আওয়াজ শুনিবামাত্র সমগ্র মদীনায় শোকের রোল পড়িয়া গেল। মহিলাগণ পর্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে হিজরী বিশ সনে দামেশ্‌কে তাঁহার ইন্তেকাল হয়। (উসদুল-গাবাহ)

(৫) হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের বুযুর্গ ও বড় আলেম হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। হযরত আলী (রাযিঃ) তাহার সম্পর্কে বলেন যে, তিনি এমন এলেম হাসিল করিয়াছিলেন যাহা অন্য কেহ হাসিল করিতে অক্ষম কিন্তু তিনি উহাকে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ)এর নিকট যখন সর্বপ্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি তাহার ভাইকে অবস্থা জানার জন্য এই বলিয়া মক্কা পাঠাইলেন যে, যে ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আমার নিকট ওহী ও আসমানের সংবাদ আসে, তাহার ব্যাপারে সকল তথ্য অবগত হইবে এবং তাহার কথাগুলি গভীরভাবে মনোযোগ দিয়া শুনিবে। তাহার ভাই মক্কা আগমন করিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া সকল তথ্য সম্পর্কে অবগত হইলেন এবং ভাইয়ের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, আমি তাহাকে সদাচার ও সচ্চরিত্রের আদেশ করিতে দেখিয়াছি। আর আমি তাহার নিকট এমন কালাম শুনিয়াছি যাহা কোন কবিতাও নয় কোন জ্যোতিষীর কথাও নয়।

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) ভাইয়ের এই সংক্ষিপ্ত কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি নিজেই সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং মক্কায় পৌঁছিয়া সোজা মসজিদে হারামে উপস্থিত হইলেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিতেন না। কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করাও সঙ্গত মনে করিলেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হযরত আলী (রাযিঃ) দেখিলেন, একজন বিদেশী মুসাফির রহিয়াছে। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কেননা, মুসাফির, গরীব ও বিদেশী লোকদের খোঁজ-খবর নেওয়া ও তাহাদের প্রয়োজন মিটাইয়া দেওয়া এই সকল বুযুর্গের স্বভাবগত অভ্যাস ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন এবং তাহার মেহমানদারী করিলেন। কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন মনে করিলেন না যে, তুমি কে? আর কেন আসিয়াছ? মুসাফির নিজেও কোন কিছু প্রকাশ করিলেন না। পরদিন সকালে তিনি আবার হারাম শরীফে আসিলেন। সারাদিন একই অবস্থায় কাটিল, নিজেও কোন খোঁজ পাইলেন না এবং কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিলেন না। সম্ভবতঃ এই কারণে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কাফেরদের শত্রুতার বিষয় খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং

তাঁহার সহিত সাক্ষাতপ্রার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দেওয়া হইত। তিনি ভাবিলেন, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক তথ্য তো পাওয়া যাইবেই না বরং উল্টা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া অযথা নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায়ও হযরত আলী (রাযিঃ) ভাবিলেন যে, বিদেশী মুসাফির যে প্রয়োজনে আসিয়াছিল সম্ভবতঃ উহা পূরা হয় নাই। সুতরাং আজও তিনি তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং রাত্রে তাহার খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই রাত্রেও তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হইল না। তৃতীয় রাত্রেও আবার সেই একই অবস্থা হইল। এইবার হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি কাজে আসিয়াছ?, তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি? হযরত আবূ যর (রাযিঃ) প্রথমে হযরত আলী (রাযিঃ)কে সত্য বলিবার শপথ ও অঙ্গীকার করাইলেন তারপর নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। সকালে আমি যখন যাইব তখন তুমিও আমার সহিত চলিও। আমি তোমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিব। তবে চরম বিরোধিতা চলিতেছে। অতএব পথ চলিবার সময় যদি এমন কোন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া যায় যাহার দ্বারা আমার সঙ্গে চলার কারণে তোমার কোন ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় তবে আমি পেশাব করিবার অথবা জুতা ঠিক করিবার ভান করিয়া বসিয়া পড়িব। তুমি সোজা হাঁটিতে থাকিবে। আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইবে না। যেন তুমি আমার সঙ্গে যাইতেছ কেহ এইরূপ ধারণা করিতে না পারে। যাহা হউক, সকাল বেলা তিনি হযরত আলী (রাযিঃ)এর সহিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া বলিলেন, তুমি এখনই ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিও না। চুপ চাপ নিজের কওমের নিকট চলিয়া যাও। যখন আমরা জয়লাভ করিব তখন চলিয়া আসিবে। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সেই পাক যাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, ঐ সকল বেঈমানের মাঝে আমি চিৎকার করিয়া তাওহীদের এই কালেমা পাঠ করিব। সুতরাং তখনই তিনি মসজিদে হারামে গিয়া উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলেন— আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

এই কালেমা পাঠের সাথে সাথে চতুর্দিক হইতে কাফেররা তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং এত বেশী মারধর করিল যে, ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল এবং তিনি মরণাপন্ন হইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ) যিনি তখনও মুসলমান হন নাই হযরত আবূ যর (রাযিঃ)কে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর শুইয়া পড়িলেন এবং লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কিরূপ জুলুম করিতেছ! এই ব্যক্তি গিফার গোত্রের লোক। এই গোত্রটি সিরিয়া যাওয়ার পথে পড়ে। তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সিরিয়ার সহিত রহিয়াছে। এই ব্যক্তি মারা গেলে সিরিয়া যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহাতে তাহাদেরও খেয়াল হইল যে, সিরিয়া হইতে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা হইয়া থাকে, সেখানকার রাস্তা বন্ধ হইয়া যাওয়া মুসীবতের কারণ হইবে, এই ভাবিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরদিন আবার তিনি হারাম শরীফে যাইয়া উচ্চকণ্ঠে কালেমা শাহাদত পাঠ করিলেন। লোকেরা এই কালেমা শুনা বরদাশত করিতে পারিত না। এইজন্য তাঁহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। দ্বিতীয় দিনও হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ভয় দেখাইয়া সরাইয়া দিলেন।

ফায়দা ঃ স্বীয় ইসলামকে গোপন রাখ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম সত্ত্বেও হযরত আবূ যর (রাযিঃ) যাহা করিয়াছেন, উহা ছিল সত্যকে প্রকাশ করার প্রতি তাহার প্রবল আবেগ ও আগ্রহ। কারণ, ইহা সত্য দ্বীন, কাহারও বাপের ইজারাদারী নয় যে, তাহার ভয়ে গোপন রাখিতে হইবে। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, হয়তো নির্যাতন বরদাশত করিতে পারিবেন না। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অমান্য করার কথা কল্পনাও করা যায় না। এই বিষয়ে নমুনা স্বরূপ কিছু আলোচনা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে আসিতেছে। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দ্বীন প্রচারের কাজে সবরকম কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন, সেহেতু হযরত আবু যর (রাযিঃ) সহজ পন্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকেই প্রাধান্য দিলেন। এই অনুসরণই এমন এক বস্তু ছিল, যে কারণে দ্বীনী ও দুনিয়াবী সর্বপ্রকার উন্নতি সাহাবায়ে কেরামের পদচুম্বন করিতেছিল এবং সকল ময়দান তাহাদের আয়ত্তে ছিল। যে কেহ একবার কালেমা শাহাদত পড়িয়া ইসলামী ঝাণ্ডার ছায়াতলে আসিয়া যাইতেন কোন বড় শক্তিই তাঁহাকে

বাধা দিতে পারিত না। চরম কোন নির্যাতন-নিপীড়ন তাঁহাদিগকে দ্বীনের প্রচার হইতে বিরত রাখিতে পারিত না ।

৬ হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাযিঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) ছিলেন সেই সকল সৌভাগ্যবান লোকদের অন্যতম যাহারা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় কঠিন হইতে কঠিনতর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। শুরুতেই পাঁচ ছয়জনের পর তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। লোহার পোশাক পরাইয়া তাঁহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত। যাহার ফলে গরম আর প্রচণ্ড তাপে ঘামের পর ঘাম বাহির হইতে থাকিত। অধিকাংশ সময় উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত। ফলে কোমরের গোশত পর্যন্ত গলিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি একজন মহিলার গোলাম ছিলেন। মহিলা সংবাদ পাইল যে, এই ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাওয়া-আসা করে। উহার শাস্তিস্বরূপ সে লোহা গরম করিয়া তাঁহার মস্তকে দাগ দিত। দীর্ঘদিন পর একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার খেলাফতের যমানায় হযরত খাব্বাব (রাযিঃ)এর নিকট তাঁহার নির্যাতন ভোগের বিস্তারিত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আরজ করিলেন যে, আপনি আমার কোমর দেখুন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহার কোমর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এমন কোমর তো কাহারো কখনও দেখি নাই। হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) আরজ করিলেন, প্রজ্বলিত কয়লার উপর আমাকে শোয়াইয়া টানা-হেঁচড়া করা হইয়াছে। আমার কোমরের চর্বি ও রক্ত দ্বারা ঐ আগুন নিভিয়াছে। এই অবস্থার পরও যখন ইসলামের তরক্কী হইল এবং সচ্ছলতা আসিল তখন উহার উপর ক্রন্দন করিতেন যে, খোদা না করুন আমাদের দুঃখ-কষ্টের বদলা দুনিয়াতেই পাইয়া গেলাম নাতো !

হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) বলেন, একদিন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অভ্যাসের খেলাফ খুব দীর্ঘ নামায পড়িলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন যে, ইহা ছিল আশা ও ভয়ের নামায। আমি এই নামাযের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট তিনটি বিষয়ে দোয়া করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে দুইটি কবুল হইয়াছে আর একটি কবুল হয় নাই। আমি এই দোয়া করিয়াছি যে, দুর্ভিক্ষের কারণে আমার সমস্ত উম্মত যেন

ধ্বংস না হইয়া যায়। ইহা কবুল হইয়াছে। দ্বিতীয় এই দোয়া করিয়াছি যে, তাহাদের উপর এমন কোন দুশমন যেন ক্ষমতা লাভ না করে, যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়। এই দোয়াও কবূল হইয়াছে। তৃতীয় এই দোয়া করিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর যেন ঝগড়া-বিবাদ না হয়। এই দোয়া কবূল হয় নাই।

হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) সাঁয়ত্রিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম সাহাবী যিনি কুফায় দাফন হইয়াছেন। ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহার কবরের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা খাব্বাব (রাযিঃ)এর উপর রহম করুন। নিজের আগ্রহে মুসলমান হইয়াছেন, নিজের খুশীতে হিজরত করিয়াছেন এবং আজীবন জেহাদে কাটাইয়াছেন। বহু দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতকে স্মরণ রাখে এবং হিসাব-নিকাশের প্রস্তুতি নেয়, জীবিকার উপযোগী সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং আপন মাওলাকে রাজী করিয়া নেয়। (উসদুল-গাবাহ)

ফায়দা ঃ বাস্তবিকই মাওলাকে রাজী করা এই সকল সৌভাগ্যবান লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কেননা তাঁহাদের জীবনের প্রতিটি কাজই ছিল মাওলা পাকের সন্তুষ্টির জন্য।

৭ হযরত আম্মার ও তাঁহার পিতামাতার ঘটনা

হযরত আম্মার (রাযিঃ) ও তাঁহার মাতা-পিতাকেও কঠিন হইতে কঠিনতর নির্যাতন করা হইয়াছিল। মক্কার উত্তপ্ত বালুকাময় জমিনের উপর তাঁহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইত। সেখান দিয়া যাতায়াতের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দান করিতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার পিতা হযরত ইয়াসির (রাযিঃ) নির্যাতন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। জালেমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় নাই। অভিশপ্ত আবূ জাহ্‌ল তাহার মাতা হযরত সুমাইয়্যা (রাযিঃ)এর লজ্জাস্থানে একটি বর্শা নিক্ষেপ করে। যাহার আঘাতে তিনি শহীদ হইয়া যান। এতদসত্ত্বেও ইসলাম ত্যাগ করেন নাই অথচ তিনি বৃদ্ধা ও দুর্বল ছিলেন কিন্তু ঐ হতভাগ্য কোন কিছুরই খেয়াল করে নাই। ইসলামে তিনিই সর্বপ্রথম শাহাদত লাভের গৌরব অর্জন করেন। ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ হযরত আম্মার (রাযিঃ) তৈয়ার করেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদীনায় তাশরীফ

লইয়া গেলেন তখন হযরত আম্মার (রাযিঃ) বলিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছায়াদার ঘর নির্মাণ করা উচিত ; যেখানে তিনি তাশরীফ রাখিবেন, দুপুর বেলায় আরাম করিবেন এবং নামাযও ছায়ার মধ্যে পড়িতে পারিবেন। অতঃপর কূবা নামক স্থানে হযরত আম্মার (রাযিঃ) প্রথমে পাথর জমা করেন এবং ইহার পর মসজিদ নির্মাণ করেন।

অত্যন্ত জোশের সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিতেন। একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, এখন যাইয়া বন্ধুদের সহিত মিলিত হইব ; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার জামাতের সহিত মিলিব। এমন সময় পিপাসা লাগিল, কোন একজনের নিকট পানি চাহিলেন। তিনি দুধ পেশ করিলেন। দুধ পান করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, তুমি দুনিয়াতে সর্বশেষ বস্তু দুধ পান করিবে। ইহার পর পরই তিনি শহীদ হইয়া যান। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৪ বৎসর। কেহ কেহ এক–আধ বৎসর কমও বলিয়াছেন। (উসদুল–গাবাহ)

(৮) হযরত সোহাইব (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সোহাইব (রাযিঃ)ও হযরত আম্মার (রাযিঃ)এর সহিত ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত আরকাম (রাযিঃ)এর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দুইজনই আলাদাভাবে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঘটনাক্রমে বাড়ীর দরজায় উভয়েরই সাক্ষাৎ হইয়া গেল। উভয়েই একে অপরের আগমনের কারণ জানিলেন। দেখা গেল দুইজনের একই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকিয়া উপকৃত হওয়া উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল। উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

এবং ইসলাম গ্রহণের পর তৎকালীন এই ক্ষুদ্র ও দুর্বল জামাতের উপর যে অত্যাচার হইত তাহাদের বেলায়ও উহার ব্যতিক্রম হইল না। সর্ব প্রকারে নির্যাতন চালানো হইল এবং কষ্ট দেওয়া হইল। অবশেষে হযরত সোহাইব (রাযিঃ) নিরুপায় হইয়া হিজরত করার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু কাফেররা ইহাও সহ্য করিতে পারিত না যে, কোন মুসলমান অন্য কোথাও যাইয়া শান্তিতে জীবন যাপন করুক। তাই কেহ হিজরত করিতেছে জানিতে পারিলে তাহাকে পাকড়াও করিবার চেষ্টা করিত, যাহাতে অত্যাচার নিপীড়ন হইতে রেহাই পাইতে না পারে। অতএব তাঁহার

পিছনেও লাগিয়া গেল এবং একদল কাফের তাহাকে পাকড়াও করিতে গেল। তিনি আপন তীর দান সামলাইয়া লইলেন যাহাতে তীর ছিল এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দেখ, তোমরা ভালভাবেই অবগত আছ যে, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদক্ষ তীরন্দাজ। একটি তীর বাকী থাকিতেও তোমরা আমার নিকটবর্তী হইতে পারিবে না। আর যখন একটি তীরও অবশিষ্ট থাকিবে না তখন আমি আমার তলোয়ার দ্বারা তোমাদের মুকাবিলা করিব। হাঁ, যখন তলোয়ারও আমার হাতে থাকিবে না, তখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিও। অতএব, যদি তোমরা চাও তবে আমার জীবনের বিনিময়ে মক্কায় রক্ষিত আমার সমস্ত সম্পদের সন্ধান তোমাদিগকে দিতে পারি। আমার দুইটি বাঁদীও রহিয়াছে। তাহাও তোমরা লইয়া যাও। ইহাতে তাহারা রাজী হইয়া গেল। তিনি তাহার সম্পদ দিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। এই সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ ؕ وَاللهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ،

অর্থাৎ কিছু লোক এমনও আছে যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন ক্রয় করিয়া লয়। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় কুবায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি হযরত সোহাইব (রাযিঃ)কে দেখিয়া বলিলেন, বড় লাভের ব্যবসা করিয়াছ। হযরত সোহাইব (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খেজুর খাইতেছিলেন। আমার চোখে অসুখ ছিল, আমিও তাঁহার সহিত খেজুর খাইতে লাগিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার চোখ উঠিয়াছে আবার খেজুরও খাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, হুযূর! আমি সেই চোখের পক্ষ হইতে খাইতেছি যাহা ভাল আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জওয়াব শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

হযরত সোহাইব (রাযিঃ) বড় বেশী খরচ করিতেন বিধায় হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি অহেতুক খরচ কর। তিনি আরজ করিলেন, আমি কোথায়ও অন্যায়ভাবে খরচ করি না। হযরত ওমর (রাযিঃ) ইন্তেকালের সময় হযরত সোহাইব (রাযিঃ)কে তাহার জানাযার নামায পড়াইবার জন্য ওসিয়ত করিয়াছিলেন। (উসদুল–গাবাহ)

(৯) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ঘটনা

হযরত ওমর (রাযিঃ) যাঁহার পবিত্র নামের উপর মুসলমানরা আজ গৌরব বোধ করে। যাহার ঈমানী জোশের কারণে আজ তেরশত বৎসর পরেও কাফেরদের অন্তর ভয়ে ভীত হয়। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের বিরোধিতা করা ও তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চেষ্টায় লাগিয়া থাকিতেন। একদিন কাফেররা পরামর্শ সভা আহবান করিল যে, এমন কেউ আছে কি যে মুহাম্মদকে কতল করিয়া দিবে? ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমিই করিব। লোকেরা বলিল, নিঃসন্দেহে তোমার পক্ষেই উহা সম্ভব। ওমর (রাযিঃ) তলোয়ার হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রওয়ানা হইলেন। এই খেয়ালে চলিতেছিলেন পথিমধ্যে যুহরা গোত্রের হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। (কেহ কেহ অন্য ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন।) তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমর! কোথায় যাইতেছ? ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে হত্যা করার ফিকিরে আছি। (নাউযুবিল্লাহ) সাআদ বলিলেন, বনু হাশেম, বনু যুহরা ও বনু আবদে মানাফ হইতে তুমি কিভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া গেলে? তাহারাও তো তোমাকে ইহার বিনিময়ে হত্যা করিয়া দিবে।

এই উত্তর শুনিয়া ওমর (রাযিঃ) বিগড়াইয়া গেলেন। বলিতে লাগিলেন মনে হইতেছে তুইও বেদ্বীন (অর্থাৎ মুসলমান) হইয়া গিয়াছিস? আয় তোকেই আগে শেষ করি। এই বলিয়া তিনি তলোয়ার বাহির করিলেন। হযরত সাআদও বলিলেন, হাঁ, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনিও তলোয়ার বাহির করিলেন। উভয় দিক হইতে তরবারী চলিবার উপক্রম হইতেই হযরত সাআদ (রাযিঃ) বলিলেন, আগে নিজের ঘরের খবর লও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতি দুইজনই মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিবার সাথে সাথে ওমর (রাযিঃ) ক্রোধে অধির হইয়া উঠিলেন এবং সোজা বোনের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে তখন (পূর্বে ৬নং ঘটনায় উল্লেখিত) হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া স্বামী-স্ত্রী দুইজনকে কুরআন শরীফ পড়াইতেছিলেন। ওমর (রাযিঃ) তাহাদেরকে কপাট খুলিতে বলিলেন। ওমর (রাযিঃ)এর আওয়াজ শুনিবামাত্র হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) তাড়াতাড়ি ভিতরে আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু তাড়াহুড়ার দরুন কুরআনের আয়াত লিখিত কাগজখানা বাহিরেই থাকিয়া গেল। বোন কপাট খুলিয়া দিলেন আর হযরত ওমর

(রাযিঃ)এর হাতে কোন বস্তু ছিল যাহা দ্বারা বোনের মাথায় আঘাত করিলেন। সাথে সাথে মাথা হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। এবং বলিলেন, আপন জানের দুশমন! তুইও বেদ্বীন হইয়া গেলি? অতঃপর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোরা কি করিতেছিলি? আর ইহা কিসের আওয়াজ ছিল? ভগ্নিপতি বলিলেন, কথাবার্তা বলিতেছিলাম। ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তোমরা কি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ? ভগ্নিপতি বলিলেন, অন্য ধর্ম যদি সত্য হয় তবে? ইহা শুনিবামাত্রই তাহার দাড়ি ধরিয়া সজোরে টান মারিলেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে মাটির উপর ফেলিয়া বেদম মারপিট করিলেন। বোন তাহাকে ছাড়াইতে গেলে তাহার মুখে এত জোরে থাপ্পড় মারিলেন যে, রক্ত বাহির হইয়া আসিল। যাহাই হউক, তিনিও উমরেরই বোন ছিলেন। বলিতে লাগিলেন, ওমর! আমাদেরকে এইজন্য মারা হইতেছে যে, আমরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। হাঁ, নিঃসন্দেহে আমরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। এবার তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। এই সময়ে হযরত উমরের দৃষ্টি কুরআনের আয়াত লিখিত ঐ কাগজখানার উপর পড়িল, যাহা তাড়াহুড়ার কারণে বাহিরেই রহিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে মারপিট করার দরুন ক্রোধের তীব্রতাও কমিয়া আসিয়াছিল। ইহা ছাড়া বোনের ঐরূপ রক্তাক্ত হইয়া যাওয়ার কারণে কিছুটা লজ্জাও লাগিতেছিল। বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা উহাতে কি আছে আমাকে দেখাও? বোন বলিয়া উঠিলেন, তুমি অপবিত্র আর অপবিত্র অবস্থায় উহা স্পর্শ করা যায় না। ওমর (রাযিঃ) বারবার বলিতে লাগিলেন কিন্তু বোন ওজু-গোসল ব্যতীত দিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে ওমর গোসল করিলেন এবং কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িলেন। উহাতে সূরা ত্বাহা লিখিত ছিল। পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই। সুতরাং তোমরা আমারই বন্দেগী কর এবং আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।

এই পর্যন্ত পড়িতেই তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা আমাকেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া চল। এই কথা শুনিয়া হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে

ওমর! আমি আপনাকে সুসংবাদ দিতেছি যে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ! ওমর ও আবূ জাহ্ল-এর মধ্যে যাহাকে আপনার পছন্দ হয় তাহার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন। (এই দুইজনই শক্তি ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিল।) মনে হইতেছে আপনার সম্পর্কেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া কবুল হইয়াছে।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং জুমার দিন সকাল বেলায় ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে কাফেরদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মুসলমানগণ সংখ্যায় ছিলেন অতি নগন্য। অপরপক্ষে ছিল সমগ্র মক্কা তথা সমগ্র আরব। কাজেই তাহাদের মধ্যেও নতুন জোশ পয়দা হইল এবং সভা সমিতি ও পরামর্শের মাধ্যমে সভা-সমিতি ও সলাপরামর্শ করিয়া মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারে চেষ্টা ও তদবীর করা হইত। তবে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণে এতটুকু লাভ অবশ্যই হইয়াছিল যে, মুসলমানগণ মক্কার মসজিদে নামায পড়িতে লাগিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং তাঁহার খেলাফত ছিল রহমতস্বরূপ। (উসদুল-গাবাহ্)

(১০) মুসলমানদের হাবশায় হিজরত এবং আবু তালিবের ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হওয়া

মুসলমান ও তাহাদের সর্দার ফখ্রে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন কাফেরদের পক্ষ হইতে জুলুম-অত্যাচার চলিতে থাকিল এবং প্রত্যহ তাহা কমিবার পরিবর্তে বাড়িতেই থাকিল তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে এই মর্মে অনুমতি দিলেন যে, তাহারা যেন এইখান হইতে অন্য কোন স্থানে চলিয়া যান। তখন অনেকেই সাহাবায়ে কেরাম হাবশায় হিজরত করেন। হাবশার বাদশা যদিও খৃষ্টান ছিলেন এবং তখনও পর্যন্ত মুসলমান হন নাই কিন্তু তাহার নরমদিল ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার খ্যাতি ছিল। সুতরাং নবুওতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে প্রথম একটি জামাআত হাবশায় হিজরত করেন। এই দলে এগার বা বারজন পুরুষ এবং চার বা পাঁচজন মহিলা ছিলেন। মক্কার কাফেররা তাঁহাদের পিছু নিয়াছিল,

যাহাতে তাঁহারা যাইতে না পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে ধরিতে পারে নাই।

মুসলমানগণ হাবশায় পৌছার কিছুদিন পরই সংবাদ পাইলেন যে, মক্কাবাসী সকলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং ইসলামের বিজয় হইয়াছে। এই সংবাদে তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মক্কার নিকটে পৌছিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভুল ছিল। মক্কার লোকেরা পূর্বের মতই বরং আগের চাইতে আরও বেশী শত্রুতা ও অত্যাচারে লিপ্ত রহিয়াছে। তখন তাহারা ভীষণ সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে তাহাদের অনেকে সেখান হইতে আবার হাবশায় ফিরিয়া গেলেন। কেহ কেহ কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিলেন। ইহাকে 'হাবশার প্রথম হিজরত' বলা হয়।

অতঃপর একটি বড় জামাত কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া হাবশায় হিজরত করেন। এই জামাআতে তিরাশিজন পুরুষ ও আঠারজন মহিলা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহাকে 'হাবশার দ্বিতীয় হিজরত' বলা হয়। কোন কোন সাহাবী উভয় হিজরত করিয়াছিলেন। আর কেহ কেহ একটিতে শরীক ছিলেন। কাফেররা যখন দেখিল যে, মুসলমানেরা হাবশায় হিজরত করিয়া সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করিতেছে। ইহাতে তাহাদের গোস্বা আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা বহু উপহার-উপঢৌকন সহ হাবশার বাদশা নাজাশীর নিকট প্রতিনিধিদল পাঠাইল। প্রতিনিধিদল বাদশার উচ্চপদস্থ সভাসদ ও পাদ্রীদের জন্যও বিপুল পরিমাণ উপহার সামগ্রী সাথে করিয়া লইয়া গেল। তাহারা প্রথমে পাদ্রী ও সভসদদের সহিত সাক্ষাত করিল এবং উপহার সামগ্রী দিয়া বাদশার দরবারে তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার ওয়াদা লইল। অতঃপর প্রতিনিধিদল বাদশার দরবারে হাজির হইল। প্রথমে তাহারা বাদশাকে সেজদা করিল। অতঃপর উপঢৌকন পেশ করিয়া নিজেদের দরখাস্ত পেশ করিল এবং ঘুষখোর আমলারা উহা সমর্থন করিল। প্রতিনিধিদল বলিল, হে বাদশাহ! আমাদের কওমের কিছুসংখ্যক নির্বোধ ছেলে নিজেদের পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া একটি নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই ধর্ম সম্বন্ধে না আমরা কিছু জানি আর না আপনি কিছু জানেন। তাহারা আপনার দেশে আশ্রয় লইয়াছে। আমাদিগকে মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং তাহাদের বাপ-চাচা ও আত্মীয়-স্বজনরা তাহাদিগকে ফেরত নেওয়ার জন্য আপনার দরবারে পাঠাইয়াছেন। আপনি তাহাদিগকে আমাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দিন। বাদশাহ বলিলেন, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করা ব্যতীত তোমাদের নিকট তাহাদিগকে সোপর্দ করা সম্ভব

নয়। প্রথমে আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া বিষয়টি তদন্ত করিব। যদি তোমাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয় তবে সোপর্দ করিয়া দিব। সুতরাং মুসলমানদিগকে ডাকা হইল। মুসলমানগণ প্রথমে খুবই পেরেশান হইলেন যে, কি করিবেন। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে সাহায্য করিল। হিম্মতের সহিত তাহারা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দরবারে উপস্থিত হইয়া স্পষ্ট কথা বলা উচিত। বাদশার নিকট পৌছিয়া তাহারা সালাম করিলেন। কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, শাহী আদব ও রীতি অনুযায়ী তোমরা বাদশাকে সেজদা করিলে না কেন? তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে আমাদের নবী আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও সেজদা করিতে অনুমতি দেন নাই। অতঃপর বাদশাহ তাঁহাদের হাল-অবস্থা জানিতে চাহিলেন। হযরত জাফর (রাযিঃ) অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন, আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতায় পতিত ছিলাম। না আল্লাহকে জানিতাম, না তাঁহার রাসূলগণ সম্পর্কে জানিতাম। আমরা পাথর পূজা করিতাম, মৃত জীব-জন্তু খাইতাম, মন্দ কাজে লিপ্ত থাকিতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিতাম। আমাদের সবলেরা দুর্বলদেরকে ধ্বংস করিয়া দিত। আমরা এই অবস্থার মধ্যে ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিলেন। যাহার বংশ মর্যাদা, সত্যতা, আমানতদারী ও পরহেযগারী সম্পর্কে আমরা ভালরূপ জানি, তিনি আমাদিগকে শরীকবিহীন এক আল্লাহর এবাদতের দিকে আহবান করিলেন এবং পাথর ও মূর্তিপূজা করিতে নিষেধ করিলেন। আমাদিগকে সৎকর্ম করিবার হুকুম দিলেন। মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি আমাদেরকে সত্য বলিবার, আমানত রক্ষা করিবার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিবার, প্রতিবেশীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার হুকুম দিলেন। নামায রোযা সদকা খয়রাত করিতে হুকুম দিলেন এবং উত্তম আখলাক শিক্ষা দিলেন। যিনা-ব্যভিচার, মিথ্যা বলা, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, কাহারও প্রতি অপবাদ দেওয়া এবং এই ধরনের সকল মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিলেন। আমাদিগকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম। তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিলাম। এই কারণে আমাদের কওম আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং আমাদেরকে সর্বপ্রকারে কষ্ট দিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া আমাদের নবীর হুকুম মুতাবেক আমরা আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি। বাদশাহ বলিলেন, তোমাদের নবী যে কুরআন লইয়া আসিয়াছেন উহার কিছুটা আমাকে শুনাও। হযরত জাফর (রাযিঃ) সূরা মারয়ামের প্রথম কয়েকখানি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন।

যাহা শুনিয়া বাদশাও কাঁদিলেন এবং উপস্থিত তাহার বিপুল সংখ্যক পাদ্রীরাও সকলেই এত কাঁদিল যে, দাড়ি ভিজিয়া গেল।

অতঃপর বাদশাহ বলিলেন, খোদার কসম! এই কালাম এবং যাহা হযরত মূসা (আঃ) লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা একই নূর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই বলিয়া তিনি মক্কার প্রতিনিধি দলকে পরিস্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, আমি ইহাদিগকে কিছুতেই তোমাদের নিকট সোপর্দ করিব না। ইহাতে কাফেররা খুব পেরেশান হইয়া পড়িল, কেননা চরমভাবে অপদস্থ হইতে হইল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিল। এক ব্যক্তি বলিল, আগামীকাল আমি এমন চাল চালিব যে, বাদশাহ ইহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবে। সঙ্গীরা বলিল, এরূপ করা উচিত হইবে না। মুসলমান হইয়া গেলেও তাহারা তো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু সে কিছুতেই তাহা মানিল না। পরদিন আবার বাদশাহের নিকট যাইয়া বলিল যে, এই মুসলমানগণ হযরত ঈসা (আঃ)এর শানে বেআদবী করিয়া থাকে। হযরত ঈসা (আঃ)কে তাহারা আল্লাহর বেটা বলিয়া স্বীকার করে না।

বাদশাহ পুনরায় মুসলমানদিগকে তলব করিলেন। সাহাবীগণ বলেন যে, দ্বিতীয় দিন তলব করার কারণে আমরা আরও বেশী পেরেশান হইয়া পড়ি। যাহাই হউক আমরা হাজির হইলাম। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তোমরা কি বল? তাহারা বলিলেন, আমরা উহাই বলিয়া থাকি যাহা আমাদের নবীর উপর তাঁহার শানে নাযিল হইয়াছে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল, তাঁহার রূহ ও তাঁহার কালেমা, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সতী সাধ্বী কুমারী মারয়াম (আঃ)এর ভিতরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নাজাসী বলিলেন, হযরত ঈসা (আঃ)ও ইহার বেশী বলিতেন না। পাদ্রীরা এই বিষয়ে পরস্পর অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। নাজাসী বলিলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে থাক।

অতঃপর বাদশাহ কাফেরদের সকল উপহারসামগ্রী ফেরত দিয়া দিলেন এবং মুসলমানদিগকে বলিলেন যে, তোমরা নিরাপদ। যে কেহ তোমাদেরকে কষ্ট দিবে তাহার জরিমানা দিতে হইবে। আর এই ঘোষণা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল যে, কেহ মুসলমানদিগকে কষ্ট দিলে তাহাকে জরিমানা দিতে হইবে। এই ঘোষণার পর সেখানে মুসলমানদের আরও বেশী সম্মান হইতে লাগিল। অপরদিকে মক্কার প্রতিনিধিদলকে অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

ইহার পর মক্কার কাফেরদের গোস্বা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণ তাহাদের অন্তরে আরও জ্বালা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা সর্বদা এই ফিকিরে থাকিত যেন মুসলমানদের সহিত লোকদের মেলামেশা বন্ধ হইয়া যায় এবং যে কোন ভাবে ইসলামের বাতি নিভিয়া যায়। এইজন্য মক্কার সরদারদের এক বড় জামাত সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করিল যে, এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে হত্যা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে হত্যা করাও কোন সহজ কাজ ছিল না। কেননা, বনু হাশেমও সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে গণ্য হইত। তাহাদের অধিকাংশ যদিও মুসলমান হইয়াছিল না, কিন্তু যাহারা মুসলমান ছিল না তাহারাও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতলের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতএব ঐ সমস্ত কাফেররা একজোট হইয়া একটি অঙ্গীকার করিল যে, বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের সহিত বয়কট করা হউক। কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে নিজের কাছে বসিতে দিবে না, তাহাদের সহিত কেহ বেচাকেনা করিবে না, কথাবার্তা বলিবে না, তাহাদের ঘরে যাইবে না এবং তাহাদেরকে নিজেদের ঘরে আসিতে দিবে না আর ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আপোষ হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য সোপর্দ করিবে না। এই অঙ্গীকার শুধু মৌখিক কথার উপরই শেষ হইল না বরং কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া নবুওতের সপ্তম বর্ষের পহেলা মুহররম তারিখে বাইতুল্লাহ শরীফের দরজায় লটকাইয়া দেওয়া হইল, যাহাতে প্রত্যেকেই উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও উহাকে মানিয়া চলার চেষ্টা করে। এই বয়কটের কারণে মুসলমানগণ দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত একটি ঘাঁটিতে নজরবন্দী হইয়া থাকেন। না বাহিরের কেহ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত, না তাহারা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। না মক্কার কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু খরিদ করিতে পারিতেন, না বাহির হইতে আগত কোন ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। যদি কেহ বাহিরে আসিত তবে তাহাকে মারপিট করা হইত। কাহারও নিকট প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করিলে পরিষ্কার না করিয়া দিত। সামান্য খাদ্যদ্রব্য যাহা তাহাদের নিকট ছিল উহাতে আর কতদিন চলিতে পারে? শেষ পর্যন্ত দিনের পর দিন অনাহারে কাটিতে লাগিল। মহিলা ও শিশুরা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিত এবং চিৎকার করিত। শিশুদের কষ্ট তাহাদের অভিভাবকদিগকে নিজেদের ক্ষুধার যন্ত্রণার চাইতেও অধিক

ব্যথিত করিত।

অবশেষে তিন বছর পর আল্লাহর ফযলে সেই অঙ্গীকারপত্রকে উইপোকায় খাইয়া ফেলিল। আর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের এই মুসীবত দূর হইল। তিন বছরের এই দিনগুলি এরূপ কঠিন বয়কট ও নজরবন্দী অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে। আর এই অবস্থায় তাহাদের উপর দিয়া কিরূপ দুঃখকষ্ট অতিবাহিত হইয়া থাকিবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত স্বীয় দ্বীনের উপর অটল রহিয়াছেন বরং উহার প্রচার-প্রসারেও সচেষ্ট রহিয়াছেন।

ফায়দা ঃ এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এমন সকল লোকেরা ভোগ করিয়াছেন যাহাদের নামে আজ আমরা পরিচয় লাভ করি এবং নিজেদেরকে তাহাদের অনুসারী বলিয়া দাবী করি এবং আমরা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের মত উন্নতির স্বপ্ন দেখি। কিন্তু একসময় একটু চিন্তা করিয়াও দেখা উচিত যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) কি পরিমাণ ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করিয়াছেন, আর আমরা দ্বীন ধর্ম ও ইসলামের জন্য কি করিয়াছি। বস্তুতঃ সফলতা ও কামিয়াবী সর্বদা চেষ্টা ও পরিশ্রম অনুপাতে হইয়া থাকে। আমরা চাই আরাম-আয়েশ, বদ-দ্বীনী ও দুনিয়া উপার্জনে কাফেরদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলি আর ইসলামী তরক্কীও আমাদের সঙ্গী হউক। ইহা কিভাবে সম্ভব?

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی　　کیں راہ کہ تو میروی بترکستان است

অর্থাৎ, হে আরাবী! আমার ভয় হয় তুমি কাবা শরীফে পৌঁছিতে পারিবে না। কেননা, তুমি যে পথ ধরিয়াছ উহা তুর্কিস্তানের পথ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি

দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এবং দ্বীনের খাতিরে স্বীয় জান-মাল, ইয্যত-আবরু সর্বস্ব উজাড় করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও—যাহার কিছু নমুনা ইতিপূর্বে আপনারা দেখিয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতি যে পরিমাণ পাওয়া যাইত, আল্লাহ করুন, উহার সামান্য কিছু আমাদের মত গুনাহগারদেরও নসীব হইয়া যায়। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা লেখা হইতেছে।

(১) ঝড়-তুফানের সময় হুযুর (সাঃ)-এর তরীকা

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, যখন আকাশে মেঘ, ঝড় ইত্যাদি দেখা দিত তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইত এবং চেহারা মোবারক বিবর্ণ হইয়া যাইত। এবং ভয়ে কখনও ঘরের ভিতরে যাইতেন কখনও বাহিরে আসিতেন আর এই দোয়া পড়িতে থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَآ اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَآ اُرْسِلَتْ بِهٖ.

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাতাসের মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং এই বাতাসের মধ্যে (বৃষ্টি ইত্যাদি) যাহা কিছু আছে উহার মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং যেই জন্য উহা পাঠানো হইয়াছে ঐসব কিছুর মঙ্গল কামনা করিতেছি। আর এই বাতাসের অমঙ্গল হইতে এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং যেই উদ্দেশ্যে উহা প্রেরিত হইয়াছে ঐসব কিছুর অমঙ্গল হইতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

আর যখন বৃষ্টি শুরু হইয়া যাইত তখন চেহারায় আনন্দ প্রকাশ পাইত। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব লোকই যখন মেঘ দেখে বৃষ্টির আলামত মনে করিয়া খুশী হয় কিন্তু আপনার মধ্যে একপ্রকার বিচলিত ভাব দেখিতে পাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে আয়েশা! আমার নিকট ইহার কি নিশ্চয়তা রহিয়াছে যে, উহার মধ্যে আযাব নাই! কওমে আদকে বাতাসের দ্বারাই আযাব দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা মেঘ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল যে, উহা হইতে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করা হইবে। অথচ উহার মধ্যে আযাব ছিল। (দুররে মানসূর)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ الاية.

অর্থাৎ—আদ জাতি যখন এই মেঘমালাকে নিজেদের বস্তির দিকে আসিতে দেখিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল যে, এই মেঘমালা তো আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। (কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন,) না উহা তো বর্ষণকারী নয় বরং উহা তো সেই আযাব যাহার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করিতে। (অর্থাৎ তোমরা নবীকে বলিতে যে, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আযাব লইয়া আস।) ইহা একটি ঘূর্ণিবার্তা

যাহার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে, যাহা তাহার রবের হুকুমে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিবে। সুতরাং তাহারা এই ঘুর্ণিবার্তার ফলে এমনভাবে ধ্বংস হইয়া গেল যে, তাহাদের ঘর-বাড়ীর চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। বস্তুতঃ অপরাধীদেরকে আমি এইভাবেই শাস্তি দিয়া থাকি। (বয়ানুল কুরআন)

ফায়দা ঃ খোদাভীতির এই চরম অবস্থা হইল সেই পবিত্র সত্তার যাঁহার সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন হওয়া স্বয়ং তাঁহারই এরশাদ দ্বারা সকলে অবগত হইয়াছে। খোদ কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে, হে নবী! আপনি তাহাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমি কখনও আযাব দিব না। আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদা থাকার পরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোদাভীতির অবস্থা এই ছিল যে, ঝড়-তুফানের আলামত দেখিলেই পূর্ববর্তী কওমসমূহের আযাবের কথা স্মরণ হইয়া যাইত। সেইসঙ্গে আমাদের অবস্থার প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা উচিত যে, আমরা সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকিয়াও ভূমিকম্প ইত্যাদি আযাব-গযব স্বচক্ষে দেখার পর উহার দ্বারা ভীত হইয়া তওবা-এস্তেগফার ও নামাযে মশগুল হওয়ার পরিবর্তে নানা প্রকার অর্থহীন গবেষণায় ব্যস্ত হইয়া পড়ি।

(২) অন্ধকারের সময় হযরত আনাস (রাযিঃ)এর আমল

নযর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ)এর জীবদ্দশায় একবার দিনের বেলায় ভীষণ অন্ধকার হইয়া গেল। আমি হযরত আনাস (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়ও কি এইরূপ অবস্থা হইত? তিনি বলিলেন, আল্লাহর পানাহ! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তো বাতাস একটু জোরে চলিলেই আমরা কিয়ামত আসিয়া গেল কিনা এই ভয়ে দৌড়াইয়া মসজিদে চলিয়া যাইতাম। অপর এক সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, ঘুর্ণিঝড় শুরু হইলে তিনি পেরেশান হইয়া মসজিদে চলিয়া যাইতেন। (জামউল-ফাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ আজ যত বড় বিপদ ও বালা-মুসীবতই আসুক আমাদের কাহারও কি মসজিদের কথা স্মরণ হয়? সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম, খাছ ব্যক্তিদের মধ্যেও কি উহার প্রতি কোন গুরুত্ব দেখা যায়? এই প্রশ্নের জবাব আপনি নিজেই চিন্তা করুন।

(৩) সূর্য গ্রহণের সময় হুযূর (সঃ)-এর আমল

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) চিন্তা করিলেন যে, এই অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল করিবেন এবং কি করিবেন তাহা দেখিতে হইবে। যাহারা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাহারা কাজ-কর্ম ছাড়িয়া দৌড়াইয়া আসিলেন। যে সমস্ত যুবক ছেলেরা মাঠে তীর চালনার অনুশীলন করিতেছিল তাহারাও উহা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল যে, এই অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল করিবেন তাহা দেখিতে হইবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাআত সালাতুল কুসুফ বা সূর্যগ্রহণের নামায পড়িলেন। যাহা এত দীর্ঘ ছিল যে, লোকেরা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কাঁদিতেছিলেন আর এই দোয়া করিতেছিলেন—"হে পরওয়ারদিগার! আপনি কি আমার সহিত এই ওয়াদা করিয়া রাখেন নাই যে, আমি বর্তমান থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে আযাব দিবেন না, আর তাহারা যখন এস্তেগফার করিতে থাকিবে তখনও তাহাদেরকে আযাব দিবেন না।"

উল্লেখ্য যে, সূরা আনফালে আল্লাহ তায়ালা এই ওয়াদা করিয়াছেন—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে নসীহত করিলেন—যখনই এমন অবস্থা হইবে এবং সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ হইবে তখন তোমরা ঘাবড়াইয়া নামাযে মনোনিবেশ করিবে। আমি আখেরাতের যেসব অবস্থা দেখিতে পাই যদি তোমরা উহা জানিতে তবে তোমরা কম হাসিতে এবং বেশী কাঁদিতে। যখনই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তখন নামায পড়িবে, দোয়া করিবে ও দান-খয়রাত করিবে।

(৪) সারারাত্র হুযূর (সাঃ)এর ক্রন্দন

একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র ক্রন্দন করিতে থাকেন এবং সকাল পর্যন্ত নামাযে এই আয়াত তেলাওয়াত করিতে থাকেন—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) আপনি যদি ইহাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে এই ব্যাপারে আপনি স্বাধীন। কেননা, ইহারা আপনার বান্দা আর আপনি তাহাদের মালিক। গোলাম অপরাধ করিলে মালিকের শাস্তি দেওয়ার অধিকার রহিয়াছে। আর যদি আপনি ক্ষমা করিয়া দেন তবে এই ব্যাপারেও আপনি স্বাধীন। কেননা আপনি মহাক্ষমতাশালী, ক্ষমা করার উপরও আপনার কুদরত রহিয়াছে। আপনি হিকমতওয়ালা, তাই আপনার ক্ষমা করাও হিকমত অনুযায়ী হইবে। (বয়ানুল কুরআন)

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনিও একবার সারারাত্র وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ এই আয়াত পড়িতে থাকেন ও ক্রন্দন করিতে থাকেন। আয়াত শরীফের অর্থ এই যে, 'কিয়ামতের দিন অপরাধীদের প্রতি হুকুম হইবে যে, দুনিয়াতে তো সকলে মিলিয়া মিশিয়া ছিলে। কিন্তু আজ অপরাধী ও নিরপরাধীরা সকলে পৃথক হইয়া যাও।

এই নির্দেশ শুনিবার পর যত ক্রন্দনই করা হউক না কেন তাহা নিতান্তই কম। কারণ, জানা নাই আমি কি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হইব, না ফরমাবরদারদের মধ্যে গণ্য হইব।

(৫) হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)এর আল্লাহর ভয়

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নবীদের ব্যতীত সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষ হইতে উত্তম। তিনি নিঃসন্দেহে জান্নাতী হইবেন। স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছেন। বরং তাহাকে একদল বেহেশতী লোকের সর্দার বলিয়াছেন। জান্নাতের প্রতিটি দরজা হইতে তাহাকে আহবান করার সুসংবাদ দান করিয়াছেন। তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে আবূ বকর (রাযিঃ)ই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

এই সবকিছু সত্ত্বেও বলিতেন, হায় আমি যদি কোন বৃক্ষ হইতাম যাহা কাটিয়া ফেলা হইত! কখনও বলিতেন, হায় আমি যদি ঘাস হইতাম যাহা জানোয়ার খাইয়া ফেলিত! কখনও বলিতেন, হায় আমি যদি কোন মুমিনের শরীরের পশম হইতাম! একবার একটি বাগানে যাওয়ার পর সেখানে তিনি একটি জানোয়ারকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হে জানোয়ার! তুমি কতই না আরামে আছ! খাও, পান কর, বৃক্ষের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াও এবং আখেরাতে তোমার উপর

হিসাব-নিকাশের কোন বোঝা নাই। হায়! আবূবকরও যদি তোমার মত হইত! (তারীখুল খোলাফা)

হযরত রাবীআ আসলামী (রাযিঃ) বলেন, একবার আমার ও হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)এর মধ্যে কোন একটা বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হইয়া গেল। তিনি আমাকে একটি শক্ত কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহাতে আমি ব্যথা পাইলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি উহা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, তুমিও আমাকে অনুরূপ কথা বলিয়া দাও, যাহাতে প্রতিশোধ হইয়া যায়। কিন্তু আমি বলিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, হয়তো তুমি এইরূপ বলিয়া দাও নতুবা আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নালিশ করিব। কিন্তু এবারও আমি প্রতিশোধমূলক কথা বলিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

বনূ আসলামের কিছু লোক আসিয়া বলিতে লাগিল বাহ! কেমন সুন্দর কথা, নিজেই বাড়াবাড়ি করিলেন আবার উল্টা নিজেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নালিশ করিবেন? আমি বলিলাম, তোমরা কি জান ইনি কে? ইনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)। তিনি যদি অসন্তুষ্ট হইয়া যান তবে আল্লাহর প্রিয় রাসূল আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। আর তাঁহার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। তখন রাবীআর ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকিবে? অতঃপর আমিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়া হাজির হইলাম এবং ঘটনা বলিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঠিক আছে! তোমার প্রতিশোধমূলক জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে তুমি উহার বদলায় এইরূপ বলিয়া দাও যে, হে আবূ বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

ফায়দা ঃ ইহাই হইল প্রকৃত আল্লাহর ভয়। একটি সাধারণ কথার উপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর এই পরিমাণ ফিকির ও গুরুত্ব পয়দা হইল যে, প্রথমে নিজে অনুরোধ করিলেন এবং পরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে চাহিলেন যে, হযরত রাবীআ (রাযিঃ) বদলা লইয়া লয়। আজ আমরা শত শত কটুকথা একে অপরকে বলিয়া ফেলি। কিন্তু কখনও এই খেয়ালও হয় না যে, আখেরাতে উহার বদলা লওয়া হইবে বা উহার হিসাব-নিকাশও হইবে।

(৬) হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর অবস্থা

হযরত ওমর (রাযিঃ) অনেক সময় একটি খড়কুটা হাতে লইয়া

বলিতেন, হায়! আমি যদি এই খড়কুটা হইতাম। কখনও বলিতেন, হায়! আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করিতেন। একবার তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিতে লাগিল, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করিয়াছে, আপনি যাইয়া আমার বদলা লইয়া দিন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে একটি চাবুক মারিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি যখন এই কাজের জন্য বসি তখন তুমি আস না আর যখন অন্য কাজে লিপ্ত হই তখন আসিয়া বল যে, আমার বদলা লইয়া দিন। লোকটি চলিয়া গেল। তিনি লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার হাতে চাবুক দিয়া বলিলেন, বদলা লও। লোকটি আরজ করিল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি ঘরে গিয়া দুই রাকাআত নামায পড়িয়া নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ওমর! তুই নিকৃষ্ট ছিলি, আল্লাহ তোকে উঁচা করিয়াছেন, তুই গোমরাহ ছিলি, আল্লাহ তোকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তুই অপদস্থ ছিলি, আল্লাহ তোকে ইয্যত দিয়াছেন, অতঃপর মানুষের বাদশাহ বানাইয়াছেন। এখন এক ব্যক্তি আসিয়া বলে যে, আমার উপর জুলুমের বদলা লইয়া দিন আর তুই তাহাকে মারিয়া দিলি। কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাকে কি জওয়াব দিবি? দীর্ঘক্ষণ তিনি এইভাবে নিজেকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলেন। (উসদুল-গাবাহ্)

তাঁহার গোলাম হযরত আসলাম (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সঙ্গে (মদীনার নিকটবর্তী হার্‌রার দিকে যাইতেছিলাম। মরুভূমির এক জায়গায় আগুন জ্বলিতে দেখা গেল। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সম্ভবতঃ কোন কাফেলা হইবে, রাত্র হইয়া যাওয়ার কারণে শহরে যাইতে পারে নাই; বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। চল, তাহাদের খোঁজ-খবর লই। রাত্রে তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেখানে পৌঁছিয়া একজন মহিলাকে দেখিতে পাইলেন, তাহার সাথে কয়েকটি শিশুসন্তান রহিয়াছে। তাহারা কান্নাকাটি ও চিৎকার করিতেছে। আর পানি ভর্তি একটি ডেকচি চুলার উপর বসানো রহিয়াছে, উহার নীচে আগুন জ্বলিতেছে। তিনি সালাম করিলেন এবং অনুমতি চাহিয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শিশুগুলি কাঁদিতেছে কেন? মহিলা জওয়াব দিল, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ডেকচির মধ্যে কি আছে? মহিলাটি বলিল, তাহাদেরকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য পানি ভর্তি করিয়া চুলার উপর রাখিয়াছি, যাহাতে কিছুটা সান্ত্বনা পায় এবং ঘুমাইয়া পড়ে।

অতঃপর মহিলাটি বলিল, আমীরুল মুমেনীন ওমর (রাযিঃ) ও আমার মধ্যে আল্লাহর দরবারেই ফয়সালা হইবে। কেননা, তিনি আমার এই অভাব-অনটনের কোন খোঁজ-খবর লন না। এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাযিঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। ওমর তোমার এই অবস্থা কি করিয়া জানিবেন? মহিলা বলিল, তিনি আমাদের আমীর হইয়াছেন অথচ আমাদের কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। হযরত আসলাম (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) আমাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বাইতুল মাল হইতে কিছু আটা, খেজুর, চর্বি ও কিছু কাপড় ও দিরহাম লইয়া একটি বস্তায় ভর্তি করিলেন। মোটকথা বস্তাটি খুব ভাল করিয়া বোঝাই করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, ইহা আমার কোমরে উঠাইয়া দাও। আরজ করিলাম, আমি লইয়া যাইব। তিনি বলিলেন, না, আমার কোমরে উঠাইয়া দাও। আমি দুই তিনবার অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিনও কি আমার বোঝা তুমিই বহন করিবে? ইহা আমিই বহন করিয়া লইয়া যাইব। কেননা কিয়ামতের দিন এই ব্যাপারে আমাকেই প্রশ্ন করা হইবে। পরিশেষে আমি বাধ্য হইয়া বস্তা তাঁহার কোমরে উঠাইয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মহিলাটির নিকট পৌছিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। সেখানে পৌছিয়াই তিনি পাতিলে আটা, কিছু চর্বি ও কিছু খেজুর ঢালিয়া দিলেন এবং নাড়াচাড়া করিতে শুরু করিলেন এবং চুলায় নিজেই ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত আসলাম (রাযিঃ) বলেন, আমি দেখিতেছিলাম তাহার ঘন দাড়ির ভিতর দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই 'হারীরা'র মত এক প্রকার খাদ্য তৈয়ার হইয়া গেল। অতঃপর তিনি তাঁহার মুবারক হস্তে সেই খাদ্য বাহির করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। তাহারা তৃপ্ত হইয়া খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তিতে মাতিয়া উঠিল। অবশিষ্ট খাদ্য অন্য বেলার জন্য মহিলার হাতে উঠাইয়া দিলেন। মহিলাটি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। হযরত উমরের পরিবর্তে তুমিই খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলে। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তুমি যখন খলীফার নিকট যাইবে তখন সেখানে আমাকেও দেখিতে পাইবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাদের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া জমিনের উপর বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। এবং বলিলেন, আমি এইজন্য বসিয়াছিলাম যে, প্রথমে তাহাদিগকে আমি ক্রন্দনরত অবস্থায়

দেখিয়াছিলাম। আমার মন চাহিল, তাহাদিগকে একটু হাসিতে দেখিয়া যাই। (আশহারে মাশাহীর, মুন্তাখাব কানযুল-উম্মাল)

হযরত ওমর (রাযিঃ) ফজরের নামাযে প্রায়ই সূরা কাহাফ, সূরা ত্বাহা ইত্যাদি বড় বড় সূরা পড়িতেন এবং কাঁদিতে থাকিতেন। কান্নার আওয়াজ কয়েক কাতার পর্যন্ত পৌছিয়া যাইত। একবার ফজরের নামাযে সূরা ইউসুফ পড়িতেছিলেন। যখন إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّٰهِ এই আয়াত পর্যন্ত পৌছিলেন তখন কাঁদিতে কাঁদিতে এমন অবস্থা হইল যে, তাহার আওয়াজ বাহির হইতেছিল না। তাহাজ্জুদের নামাযে কখনও কখনও কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া যাইতেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়িতেন।

ফায়দা ঃ ইহাই ছিল সেই মহান ব্যক্তির আল্লাহ-ভীতি যাহার নাম শুনিলে বড় বড় নামজাদা রাজা-বাদশাহ পর্যন্ত ভয়ে কাঁপিতে থাকিত। সাড়ে তেরশত বছর পর আজও পর্যন্ত তাঁহার শান-শওকত সর্বজন স্বীকৃত। আজ কোন রাজা-বাদশাহ বা উজির-নাজির নয় সাধারণ কোন আমীরও কি প্রজা সাধারণের সহিত এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে?

(৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর নসীহত

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর জাহেরী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর একদিন আমি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিলাম। তিনি মসজিদে হারামে গেলেন। সেখানে একটি মজলিস হইতে ঝগড়ার আওয়াজ আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, আমাকে এই মজলিসের নিকট লইয়া চল। আমি সেইদিকে লইয়া গেলাম। সেখানে পৌছিয়া তিনি সালাম করিলেন। লোকেরা তাঁহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি বসিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কি ইহা জানা নাই যে, আল্লাহর খাছ বান্দাদের জামাত হইল ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে তাঁহার ভয় নিশ্চুপ করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহারা অক্ষমও নহেন, বোবাও নহেন। বরং তাহারা সুবক্তা, বাকশক্তি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু আল্লাহর বড়ত্বের স্মরণ তাহাদের আকল-বুদ্ধিকে হরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই কারণে তাহাদের হৃদয় ভগ্ন থাকে এবং যবান চুপ থাকে। আর এই অবস্থার উপর যখন তাহাদের পরিপক্কতা অর্জন হইয়া যায় তখন উহার কারণে তাহারা নেক কাজে তাড়াতাড়ি করেন। তোমরা তাহাদের হইতে কত দূরে চলিয়া গিয়াছ। ওয়াহাব (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি আর দুই ব্যক্তিকেও এক জায়গায় একত্রে দেখি নাই।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আল্লাহর ভয়ে এত বেশী ক্রন্দন করিতেন যে, সর্বদা অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার কারণে চেহারার উপর দুইটি নালি হইয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নেক কাজের উপর এহতেমাম করিবার একটি সহজ ব্যবস্থা বাতলাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহর বড়ত্ব ও তাহার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করিবে। ফলে সর্বপ্রকার নেক আমল করা সহজ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ এইরূপ আমল নিঃসন্দেহে এখলাসে পরিপূর্ণ থাকিবে। আমরা যদি রাত্রদিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সামান্য একটু সময়ও এই চিন্তা–ফিকিরের জন্য বাহির করিয়া লই তবে ইহা কোনই মুশকিল নহে?

(৮) তাবুকের সফরে কওমে সামুদের বস্তি অতিক্রম

গাযওয়ায়ে তাবুক একটি বিখ্যাত যুদ্ধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ইহাই ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাইলেন যে, রোম সম্রাট মদীনা শরীফের উপর হামলা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী লইয়া সিরিয়ার পথে মদীনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নবম হিজরীর ৫ই রজব বৃহস্পতিবার উহার মুকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। যেহেতু প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিল এবং মুকাবিলাও ছিল অত্যন্ত কঠিন সেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, রোম সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে কাজেই প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যুদ্ধের জন্য চাঁদা উঠাইতে শুরু করিলেন। ইহাই সেই যুদ্ধ যাহাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ঘরের সমস্ত সামান লইয়া আসেন। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার পরিবার পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। হযরত ওমর (রাযিঃ) ঘরের সম্পূর্ণ সামানের অর্ধেক লইয়া আসেন। যাহার বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ নম্বর ঘটনায় আসিতেছে। হযরত ওসমান গনী (রাযিঃ) সমগ্র বাহিনীর এক–তৃতীয়াংশের সম্পূর্ণ সামানের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্যের চাইতে বেশীই আনিয়াছিলেন। এতদসত্বেও যেহেতু সার্বিকভাবে অভাব অনটন চলিতেছিল সেহেতু দশ দশ ব্যক্তির ভাগে একটি করিয়া উট জুটিয়াছিল। তাহারা পালাক্রমে

উহাতে আরোহণ করিতেন। এইজন্য ইহা 'জাইশুল উসরা' (বা অভাবগ্রস্ত বাহিনী) নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ অত্যন্ত কঠিন ছিল। একদিকে সফরও ছিল দূরের, মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের। অপরদিকে মদীনা শরীফে তখন খেজুর পাকার ভরা মৌসুম। বাগানের খেজুর সম্পূর্ণ পাকিয়া গিয়াছিল। খেজুরের উপরই মদীনাবাসীদের জীবিকা নির্ভর করিত। আর সারা বছরের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার ইহাই ছিল একমাত্র মৌসুম। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য ইহা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল। একদিকে আল্লাহর ভয় ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, যে কারণে যুদ্ধে না যাইয়া কোন উপায় ছিল না। অন্যদিকে এতসব কঠিন সমস্যা যাহার প্রতিটিই ছিল একেকটি স্বতন্ত্র বাধা। বিশেষতঃ সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল পাকাপোক্তা খেজুরের বাগানসমূহ কোন রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যতীত ছাড়িয়া যাওয়া কত যে কঠিন ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সবকিছু সত্বেও আল্লাহর ভয় তাহাদের উপর প্রবল ছিল। মুনাফিক ও অক্ষম ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে শিশু ও নারীরাও রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে মদীনা শরীফের প্রয়োজনে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে, অথবা কোন প্রকার সওয়ারীর ব্যবস্থা না হওয়ায় যাহারা ক্রন্দন রত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছেন, যাহাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইয়াছে—

تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ উল্লেখিত কয়েক শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সকল সাহাবায়ে কেরাম এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

অবশ্য তিনজন সাহাবী কোন ওযর না থাকা সত্বেও শরীক ছিলেন না। তাহাদের ঘটনা সামনে আসিতেছে।

পথিমধ্যে কওমে সামূদের বস্তি এলাকা অতিক্রম কালে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় দিয়া নিজ চেহারা মোবারক ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং উটনীকে দ্রুত চালাইলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কেও হুকুম করিলেন, জালেমদের বস্তিগুলি কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুত অতিক্রম কর। আর এই ভয়ের সহিত অতিক্রম কর যে, খোদা না করুন, সেই আযাব যেন তোমাদের উপরও আসিয়া না পড়ে যাহা তাহাদের উপর নাযিল হইয়াছিল। (ইসলাম, খামীস)

ফায়দা ঃ আল্লাহর পেয়ারা নবী ও রাসূল আযাবের স্থান ভীত–সন্ত্রস্ত হইয়া অতিক্রম করেন এবং জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যাহারা এই কঠিন অবস্থাতেও জীবন উৎসর্গের প্রমাণ দিলেন, তাহাদিগকেও ক্রন্দন করিতে করিতে অতিক্রম করার হুকুম করিলেন। যেন

আল্লাহ না করুন, সেই আযাব তাহাদের উপরও নাজিল হইয়া না যায়। আর আমাদের অবস্থা হইল এই যে, কোন এলাকায় ভূমিকম্প হইলে আমরা উহাকে ভ্রমণের ক্ষেত্র বানাইয়া লই এবং ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনের জন্য যাই। কান্নাকাটি করা তো দূরের কথা, আমরা কান্নার খেয়ালও দিলে আনয়ন করি না।

(৯) তাবূকের যুদ্ধে হযরত কা'ব (রাযিঃ)এর অনুপস্থিতি ও তওবা

তাবুকের যুদ্ধে অক্ষম মাযুর লোক ছাড়াও আশিজনের চেয়ে বেশী মুনাফিক, আনসারদের মধ্য হইতে ছিল এবং প্রায় সমপরিমাণ বেদুঈন এবং ইহা ছাড়াও বাহিরের লোকদের মধ্য হইতে বেশ একটি বড় দল অংশগ্রহণ করে নাই। ইহারা শুধুমাত্র যুদ্ধে শরীক না হইয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই বরং অন্য লোকদিগকেও لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ অর্থাৎ 'প্রচণ্ড গরমে তোমরা বাহির হইও না' বলিয়া বাধা দিত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন যে, 'জাহান্নামের আগুনের গরম আরও প্রচণ্ড ও ভয়াবহ।'

উপরোল্লিখিত লোকজন ছাড়া তিনজন সত্যবাদী খাঁটি মুসলমানও এমন ছিলেন যাহারা বিশেষ কোন ওজর ছাড়াই এই যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই। তাহাদের একজন হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযিঃ), দ্বিতীয় জন হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাযিঃ) এবং তৃতীয়জন ছিলেন হযরত মুরারাহ ইবনে রাবী (রাযিঃ)। এই তিনজন সাহাবী কোন প্রকার মুনাফেকী বা উযরের কারণে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকেন নাই। বরং তাহাদের সচ্ছলতাই যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে হযরত কা'ব (রাযিঃ) নিজেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। উহা সামনে আসিতেছে।

হযরত মুরারাহ ইবনে রাবী (রাযিঃ)–এর বাগানে খুব বেশী ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার ধারণা হইল, আমি যদি যুদ্ধে চলিয়া যাই তবে সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাছাড়া আমি তো সবসময় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াই থাকি। এইবার না গেলে তেমন আর কি অসুবিধা হইবে? এইজন্য তিনি রহিয়া গেলেন কিন্তু যখন তিনি তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন তখন যেহেতু একমাত্র বাগানই ইহার কারণ হইয়াছিল এইজন্য সমস্ত বাগানই তিনি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দিলেন।

হযরত হেলাল (রাযিঃ)এর পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়–স্বজন বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ছিটাইয়া ছিল। ঘটনাক্রমে এই সময়ে তাহারা সকলেই আসিয়া একত্রিত হইয়া গেলেন। তাহারও এইরূপ ধারণা হইল

যে, সকল যুদ্ধেই তো শরীক হইয়া থাকি, এইবার না গেলে তেমন আর কি অসুবিধা হইবে? এইভাবে তাহারও আর যুদ্ধে যাওয়া হইল না। কিন্তু পরে যখন ভুল বুঝিতে পারিলেন যে, এই সম্পর্কই জেহাদে শরীক হইতে না পারার কারণ হইয়াছে, তখন সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে মনস্থ করিলেন।

হযরত কা'ব (রাযিঃ)এর ঘটনা হাদীস শরীফে খুব বেশী আসিয়াছে। তিনি বিস্তারিতভাবে নিজের ঘটনা শুনাইতেন। তিনি বলেন, তাবুকের পূর্বে কোন যুদ্ধের সময়ই আমি এত বেশী সচ্ছল ও মালদার ছিলাম না, যতখানি তাবুকের সময় ছিলাম। এই সময়ে আমার নিকট নিজস্ব দুইটি উটনী ছিল। ইতিপূর্বে কখনও আমার নিজস্ব দুইটি উটনীর মালিক হওয়ার সুযোগ হয় নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যেই দিকে যুদ্ধে যাইতে মনস্থ করিতেন, উহা প্রকাশ করিতেন না বরং অন্যান্য দিকের হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় যেহেতু গরম ছিল প্রচণ্ড, সফরও বহু দূরের ছিল, তাহা ছাড়া শত্রু সৈন্যও ছিল অনেক বেশী। এইজন্য পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে লোকেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং মুসলমানদের এত বিশাল জামাআত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হইয়া গেল যে, সকলের নাম রেজিষ্টারভুক্ত করাও মুশকিল ছিল। আর লোকসংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে কেহ না যাওয়ার ইচ্ছা করিয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিয়া যাইতে চাহিলেও অসম্ভব ছিল না।

এইদিকে ফল সম্পূর্ণরূপে পাকিয়া আসিতেছিল। আমিও প্রত্যহ সকাল হইতে সফরের সামানপত্র তৈয়ারী করার এরাদা করিতাম কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনপ্রকার তৈয়ারী আর হইয়া উঠিত না। তবে আমি মনে মনে ভাবিতাম যে, আমার সচ্ছলতা রহিয়াছে যখন এরাদা পোক্তা হইয়া যাইবে তৎক্ষণাৎ তৈয়ারীও সম্পন্ন হইয়া যাইবে। এইভাবে গড়িমসি করিতে করিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন। কিন্তু আমার তৈয়ারী শেষ হইল না। তারপরও আমি এইরূপ খেয়াল করিতে থাকিলাম যে, এক দুইদিনের মধ্যেই তৈয়ার হইয়া যাইয়া মিলিত হইব। এইভাবে আজ নয় কাল করিতে থাকিলাম। এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া গেলেন। ঐ সময় আমি চেষ্টাও করিলাম কিন্তু আমার তৈয়ারী হইয়া উঠিল না। এখন আমি মদীনার যেদিকেই তাকাই শুধু কলঙ্কযুক্ত মুনাফিক ও কিছু অক্ষম লোক দেখিতে পাই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, কা'বের কি হইল? তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না? এক ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার ধনসম্পদ ও সাজসজ্জার অহংকার তাহাকে রুখিয়া দিয়াছে। হযরত মুআয (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ। আমি যতটুকু জানি, সে ভাল মানুষ। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ চুপ রহিলেন, কোন কিছুই বলিলেন না। অবশেষে কয়েকদিনের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর মদীনায় ফিরিয়া আসিবার খবর শুনিলাম। ইহাতে দুঃখ ও অনুতাপ আমাকে ঘিরিয়া ধরিল, আমি খুবই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলাম। মনে নানারকম মিথ্যা অজুহাত উদয় হইতে লাগিল যে, আপাততঃ কোন মিথ্যা অজুহাত খাড়া করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাগ হইতে জান বাঁচাইয়া লই। পরে সুযোগমত মাফ চাহিয়া লইব। এই ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিতে থাকিলাম। কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসিয়াই পড়িয়াছেন তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সত্য ছাড়া আর কিছুতেই মুক্তি নাই। সুতরাং সত্য বলিবারই মজবুত এরাদা করিয়া ফেলিলাম।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত শরীফ এই ছিল যে, তিনি যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন প্রথমে মসজিদে তশরীফ লইয়া যাইতেন এবং দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িতেন। অতঃপর মানুষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেখানে কিছু সময় তশরীফ রাখিতেন। অতএব, অভ্যাস অনুযায়ী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। মুনাফিকরা আসিয়া মিথ্যা অজুহাত পেশ করিতে লাগিল ও কসম খাইতে আরম্ভ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বাহ্যিক ওজর-আপত্তি কবূল করিতে লাগিলেন এবং বাতেনী অবস্থা আল্লাহর উপর সোপর্দ করিতে থাকিলেন। ইত্যবসরে আমিও হাজির হইলাম ও সালাম করিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারাজীর ভঙ্গিতে মুচকি হাসিলেন এবং মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি মুখ ফিরাইয়া নিলেন! খোদার কসম! আমি না তো মুনাফিক হইয়া গিয়াছি, আর না আমার ঈমানের মধ্যে কোন সংশয় রহিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এখানে আস! আমি নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছে? তুমি উটনী কিনিয়া রাখিয়াছিলে না? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি

যদি এই মুহূর্তে কোন দুনিয়াদারের নিকট হইতাম তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমি যে কোন যুক্তিসংগত মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া তাহার ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া যাইতাম। কেননা, আল্লাহ পাক আমাকে কথা বলিবার যোগ্যতা দান করিয়াছেন। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার জানা আছে যে, আজ যদি মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া আপনাকে রাজী করিয়াও লই তবে অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। আর যদি সত্য সত্য বলিয়া দেই তাহা হইলে আপনি রাগান্বিত হইবেন বটে কিন্তু শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা আপনার রাগ দূর করিয়া দিবেন। তাই সত্যই বলিতেছি যে, আল্লাহর কসম! আমার কোন ওজর ছিল না। আমি অন্য সময়ের তুলনায় ঐ সময় সবচাইতে বেশী অবসর এবং সচ্ছল ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, আচ্ছা যাও। তোমার ফয়সালা আল্লাহ তায়ালা করিবেন। সেখান হইতে চলিয়া আসার পর আমার গোত্রের বহু লোক আমাকে তিরস্কার করিল যে, তুমি তো ইতিপূর্বে কোন গোনাহ করিয়াছিলে না, কাজেই কোন ওজর পেশ করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইস্তেগফারের দরখাস্ত করিতে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তেগফার তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে ছাড়া এমন আরও কেহ আছে কি, যাহার সহিত অনুরূপ আচরণ করা হইয়াছে? তাহারা বলিল, হাঁ, আরো দুইজন আছে, যাহাদের সহিত এইরূপ আচরণ করা হইয়াছে। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহারাও উহাই বলিয়াছে আর তাহাদেরকে এই উত্তরই দেওয়া হইয়াছে যাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন হইল, হেলাল ইবনে উমাইয়্যা অপরজন হইল মুরারা ইবনে রবী। আমি দেখিলাম, এই দুইজন নেককার ও বদরী সাহাবীও আমার সাথে শরীক আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তাও নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন যেন কেহ আমাদের সহিত কথা না বলে। আর ইহাই নিয়মের কথা যে, যাহার সহিত সম্পর্ক থাকে, তাহার উপরই রাগ হয়। আর সতর্কও তাহাকেই করা হয় যাহার মধ্যে সংশোধনের যোগ্যতা থাকে। যাহার মধ্যে সংশোধনের যোগ্যতা নাই তাহাকে সতর্ক কে করে।

কা'ব (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধের পর লোকেরা আমাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিল এবং আমাদের হইতে সরিয়া থাকিতে লাগিল এবং মনে হইল, যেন দুনিয়াটাই

বদলাইয়া গিয়াছে এমনকি পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার নিকট সংকীর্ণ মনে হইতে লাগিল। সকলকেই অপরিচিত মনে হইতে লাগিল, ঘর-দরজাও যেন অপরিচিত হইয়া গেল। আমার সবচাইতে বেশী চিন্তা এই ব্যাপারে ছিল যে, আমি যদি এমতাবস্থায় মারা যাই, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাযার নামায পড়িবেন না। আর আল্লাহ না করুন, যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া যায়, তবে আমি চিরদিনই এই অবস্থায় থাকিয়া যাইব। কেহই আমার সাথে কথা বলিবে না এবং মৃত্যুর পর জানাযার নামাযও পড়িবে না। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের খেলাফ কেহই করিতে পারে না।

মোটকথা, এইভাবে আমাদের পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার সঙ্গীদ্বয় প্রথম হইতেই ঘরে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া গিয়াছিল। আমি সকলের মধ্যে শক্তিশালী ছিলাম। চলাফেরা করিতাম, হাটে-বাজারে যাইতাম, নামাযেও শরীক হইতাম। কিন্তু কেহই আমার সহিত কথা বলিত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির হইয়া সালাম করিতাম এবং গভীরভাবে লক্ষ্য করিতাম, হুযূর (সাঃ)এর ঠোঁট মোবারক জবাব প্রদানের উদ্দেশ্যে নড়ে কিনা। নামাযান্তে তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট নামায আদায় করিতাম এবং আড়চোখে দেখিতাম, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কিনা। যখন নামাযে রত থাকিতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাইতেন, কিন্তু যখন আমি তাঁহার দিকে তাকাইতাম তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া নিতেন মনোযোগ সরাইয়া নিতেন।

মোটকথা, এই অবস্থা চলিতে থাকিল। মুসলমানদের কথাবার্তা না বলা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। একদিন আমি আবু কাতাদার দেওয়ালের উপর আরোহণ করিলাম। সম্পর্কে তিনি আমার চাচাত ভাইও ছিলেন। আর আমার সাথে তাহার গভীর সম্পর্কও ছিল। আমি উপরে উঠিয়া তাহাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমি তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি আমার মহব্বত রহিয়াছে? তিনি ইহারও কোন জবাব দিলেন না। দ্বিতীয় বার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। এবারও কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয় বার আবার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি বলিলেন যে, আল্লাহ ও তাহার রাসূলই ভাল জানেন। এই বাক্য শুনিবার পর আমার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে

একদিন আমি মদীনার বাজারে যাইতেছিলাম। এমন সময় জনৈক কিবতীকে বলিতে শুনিলাম, তোমরা কেহ আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের ঠিকানা বলিয়া দাও। সেই কিবতী নাসরানী ছিল এবং সিরিয়া হইতে মদীনায় শস্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। লোকেরা আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া পরিচয় করাইয়া দিল। সে আমার কাছে আসিল এবং গাস্সানের কাফের বাদশার পক্ষ হইতে আমাকে একটি চিঠি দিল। উহাতে লেখা ছিল আমরা জানিতে পারিয়াছি, তোমাদের মনিব তোমার উপর জুলুম করিয়াছে। আল্লাহ তোমাকে অপমানের স্থানে না রাখুন এবং বরবাদ না করুন। তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আস আমরা তোমার সাহায্য করিব। (দুনিয়ার রীতিও ইহাই যে, বড়দের পক্ষ হইতে যখন ছোটদেরকে শাসন করা হয় তখন প্রতারকরা তাহাদেরকে আরও বেশী ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। এবং হিতাকাঙ্খী সাজিয়া এই ধরনের কথা দ্বারা উস্কানী দিয়াই থাকে। কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমি এই চিঠি পড়িয়া ইন্নালিল্লাহ পড়িলাম যে, আমার অবস্থা এই পর্যায় পৌছিয়া গিয়াছে যে, কাফের পর্যন্ত আমার ব্যাপারে লিপ্সা করিতেছে এবং আমাকে ইসলাম হইতেও বিচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইহা আরেকটি মুসীবত আসিল। এই চিঠি লইয়া আমি একটি চুলাতে নিক্ষেপ করিলাম। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অসন্তুষ্টির কারণে আজ আমার এই অবস্থা যে, কাফেরও আমার ব্যাপারে লিপ্সা করিতেছে।

এমতাবস্থায় যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত আমার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এই হুকুম লইয়া আসিল যে, আপন স্ত্রীকেও ত্যাগ কর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কি অর্থ? তাহাকে তালাক দিয়া দিব কি? বলিল, না, বরং পৃথক থাক। আমার অপর দুই সঙ্গীর কাছেও ঐ দূতের মাধ্যমে একই নির্দেশ পৌছে। আমি স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি পিত্রালয়ে চলিয়া যাও। যতদিন আল্লাহর তরফ হইতে ইহার কোন ফয়সালা না আসে ততদিন সেইখানেই থাকিবে। হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হেলাল একেবারে বৃদ্ধ লোক। কোন সাহায্যকারী না থাকিলে তো তিনি ধ্বংস হইয়া যাইবেন। আপনি যদি অনুমতি দেন এবং অসুবিধা মনে না করেন তবে আমি তাহার কিছু কাজকর্ম করিয়া দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

কোন অসুবিধা নাই তবে সহবাস করিবে না। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার তো এই কাজের প্রতি কোন আকর্ষণই নাই, এই ঘটনা যেইদিন হইতে ঘটিয়াছে সেইদিন হইতে কান্নাকাটির ভিতর দিয়াই তাহার সময় অতিবাহিত হইতেছে।

কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমাকেও বলা হইল যে, তুমিও যদি হেলাল (রাযিঃ)এর ন্যায় স্ত্রীর খেদমত গ্রহণের অনুমতি লইয়া লইতে, সম্ভবতঃ মিলিয়া যাইত। আমি বলিলাম, তিনি বৃদ্ধ আর আমি যুবক। নাজানি আমাকে কি জবাব দেওয়া হয়। তাই আমি সাহস করি না। যাহা হউক এইভাবে আরো দশদিন কাটিয়া গেল। আমাদের সহিত কথাবার্তা ও মেলামেশা বন্ধ অবস্থার ৫০দিন পূর্ণ হইয়া গেল। ৫০তম দিনে ফজরের নামায আপন ঘরের ছাদের উপর আদায় করিয়া অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া বসিয়াছিলাম। জমিন আমার জন্য একেবারেই সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং জীবন ধারণ কঠিন হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ সালা' পাহাড়ের চূড়া হইতে এক ব্যক্তি সজোরে চিৎকার করিয়া বলিল, কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইহা শোনামাত্রই আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম এবং আনন্দে কাঁদিতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম মুসীবত কাটিয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর আমাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করিলেন। ঘোষণা মাত্রই একব্যক্তি তো পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিয়া জোরে আওয়াজ দিলেন যাহা সবার আগে পৌছিয়া গেল। তারপর আরেক ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাড়াতাড়ি আসিলেন। এই সুসংবাদ দানকারীকে আমি আমার পরিধানের কাপড় দান করিয়া দিলাম। খোদার কসম, ঐ দুইটি কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় আমার মালিকানায় ছিল না। অতঃপর দুইটি কাপড় ধার করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। অপর দুই সঙ্গীর কাছেও এমনিভাবে লোকেরা সুসংবাদ লইয়া গেল। আমি যখন মসজিদে নববীতে হাজির হইলাম লোকজন যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির ছিল আমাকে মোবারকবাদ জানাইতে দৌড়িয়া আসিল। সর্বপ্রথম আবু তালহা (রাযিঃ) আগাইয়া আসিলেন এবং আমাকে মোবারকবাদ জানাইয়া মুসাফাহা করিলেন, যাহা আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিলাম। তাহার নূরানী চেহারা খুশীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং চেহারায় আনন্দপ্রভা পরিস্কার বুঝা যাইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

চেহারা মোবারক খুশীর সময় চাঁদের ন্যায় ঝলমল করিত। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তওবার পরিপূর্ণতা হইল এই যে, আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দিলাম। (কারণ এই সম্পদই এই মুসীবতের কারণ হইয়াছিল।) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলিলেন, ইহাতে কষ্ট হইবে কিছু অংশ নিজের কাছেও রাখিয়া দাও। আমি বলিলাম, আচ্ছা, খায়বারের অংশটুকু আমার থাকুক। সত্যই আমাকে মুক্তি দিয়াছে অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, সর্বদাই সত্য বলিব। (দুররে মানসূর, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ ইহা ছিল সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর আনুগত্য, দ্বীনদারী এবং খোদাভীতির নমুনা। তাঁহারা সব সময় যুদ্ধে শরীক ছিলেন। একবার অনুপস্থিত থাকিবার কারণে কিরূপ অসন্তুষ্টি হইল ; আর কেমন আনুগত্যের সহিত উহা বরদাশত করিলেন যে, দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন কান্নাকাটির ভিতর দিয়া কাটাইলেন এবং যে সম্পদের কারণে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল উহাও সদকা করিয়া দিলেন। কাফেরদের উস্কানিতে উত্তেজিত না হইয়া আরো অনুতপ্ত হইলেন এবং ইহাও আল্লাহ ও রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন এবং ভাবিলেন যে, আমার দ্বীনি দুর্বলতা এই পর্যায়ে পৌছিয়া গিয়াছে যে, কাফের পর্যন্ত আমাকে বেদ্বীন বানাইবার লিপ্সা করিতেছে।

আমরাও মুসলমান, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের হুকুম ও নির্দেশাবলীও সামনে রহিয়াছে। নামাযের কথাই ধরুন, ঈমানের পর যাহার সমতুল্য কোন বস্তুই নাই কয়জনই বা এই হুকুমকে পালন করে। আর যাহারা পালন করে তাহারাও কিরূপে করে। ইহার পর যাকাত ও হজ্জের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। কেননা উহাতে তো মালও খরচ হয়।

(১০) সাহাবীদের হাসির কারণে হুযূর (সঃ)-এর সতর্ক করা ও কবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য তশরীফ আনিলেন। কতিপয় লোক খিলখিল করিয়া হাসিতে ছিল এবং হাসির কারণে তাহাদের দাঁত দেখা যাইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করিতে তবে যে অবস্থা আমি দেখিতে পাইতেছি তাহা সৃষ্টি হইত না। অতএব তোমরা মৃত্যুকে বেশী করিয়া স্মরণ কর। কবরের উপর এমন কোন দিন

অতিবাহিত হয় না যেদিন সে এই ঘোষণা দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, নির্জনতার ঘর, মাটির ঘর, পোকা-মাকড়ের ঘর। যখন কোন মুমেন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন সে বলে, তোমার আগমন মোবারক। তুমি খুব ভাল করিয়াছ আসিয়া গিয়াছ। জমিনের বুকে যত লোক বিচরণ করিত তন্মধ্যে তুমি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলে। আজ তুমি আমার নিকট আসিয়াছ, তুমি আমার উত্তম আচরণ দেখিবে। অতঃপর যে পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌছে ঐ পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হইয়া যায় আর উহার দিকে জান্নাতের একটি দরজা খুলিয়া যায়। যাহা দ্বারা জান্নাতের হাওয়া ও খোশবূ তাহার দিকে আসিতে থাকে।

আর যখন কোন বদকারকে কবরে রাখা হয় তখন সে বলে, তোর আগমন না-মোবারক, তুই আসিয়া ভাল করিস নাই। জমিনের বুকে যত লোক চলাচল করিত তাহাদের মধ্যে তোর প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুই আমার সোপর্দ হইয়াছিস তখন আমার আচরণও দেখিতে পাইবি। অতঃপর কবর তাহাকে এত জোরে চাপ দেয় যে, পাঁজরের হাড় একটি অপরটির ভিতর ঢুকিয়া যায় এবং এইরূপ সত্তরটি অজগর তাহার উপর নিযুক্ত হইয়া যায় যে, যদি উহার একটিও জমিনের উপর ফুঁৎকার মারে তবে উহার প্রভাবে জমিনের উপর কোন ঘাস পর্যন্ত বাকী থাকিবে না। সে তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত দংশন করিতে থাকে।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। (মিশকাত)

ফায়দা ঃ আল্লাহর ভয় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। মৃত্যুর স্মরণ উহার জন্য উপকারী এইজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যবস্থাপত্র বলিয়া দিয়াছেন। অতএব, কখনও কখনও মৃত্যুকে স্মরণ করিতে থাকা অত্যন্ত জরুরী ও উপকারী।

(১১) হযরত হানযালা (রাযিঃ)এর মুনাফেকীর ভয়

হযরত হানযালা (রাযিঃ) বলেন, একবার আমরা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে ছিলাম। তিনি ওয়াজ করিলেন। ইহাতে অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিজেদের স্বরূপ আমাদের সামনে প্রকাশ পাইয়া গেল। অতঃপর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস

হইতে উঠিয়া ঘরে আসিলাম, বিবি-বাচ্চা কাছে আসিল এবং দুনিয়ার কিছু আলোচনা শুরু হইয়া গেল, ছেলেমেয়েদের এবং স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা হাসিতামাশা শুরু হইয়া গেল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে অন্তরের যে অবস্থা ছিল তাহা আর রহিল না। হঠাৎ মনে হইল যে, আমি পূর্বে কি অবস্থায় ছিলাম আর এখন কি হইয়া গেল। মনে মনে বলিলাম, তুই তো মুনাফেক হইয়া গিয়াছিস। কারণ প্রকাশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তো পূর্বের অবস্থা ছিল আর এখন ঘরে আসিয়া এই অবস্থা হইয়া গেল। অত্যন্ত চিন্তিত এবং দুঃখিত অবস্থায় এই বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইলাম যে, হানযালা মুনাফেক হইয়া গিয়াছে। সম্মুখ হইতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আসিতেছিলেন, বলিলাম, হানাযালা তো মুনাফেক হইয়া গিয়াছে। তিনি ইহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, সুবহানাল্লাহ! কি বলিতেছ? কখনও হইতে পারে না। আমি অবস্থা বর্ণনা করিলাম যে, আমরা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে থাকি আর তিনি জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমরা এমন হইয়া যাই যেন জান্নাত-জাহান্নাম আমাদের সামনে রহিয়াছে আর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে চলিয়া আসি তখন বিবি-বাচ্চা ও ক্ষেত-খামারের ধান্ধায় জড়িত হইয়া উহাকে ভুলিয়া যাই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, এমন অবস্থা তো আমারও হয়। অতএব উভয়েই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। হানযালা (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো মুনাফেক হইয়া গিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? হানযালা (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা যখন আপনার খেদমতে হাজির হই আর আপনি জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমরা এমন হইয়া যাই যেন জান্নাত-জাহান্নাম আমাদের সামনে রহিয়াছে। কিন্তু যখন আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া বিবি-বাচ্চা ও ঘর-বাড়ীর ধান্ধায় লিপ্ত হই তখন সব ভুলিয়া যাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঐ সত্তার কসম যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, আমার মজলিসে থাকাকালীন সময়ে তোমাদের যে অবস্থা হয় তাহা যদি সবসময় থাকে, তবে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে বিছানায় এবং রাস্তায় মুসাফাহা করিতে আরম্ভ করিবে। তবে হানযালা! এই অবস্থাও কখনও কখনও হয়। (সর্বদা থাকে না।) (এহ্ইয়া, মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ মানুষের সাথে মানবিক প্রয়োজনসমূহও লাগিয়া আছে, যাহা পুরা করাও জরুরী, খানাপিনা বিবি-বাচ্চা এবং তাহাদের খোঁজ-খবর লওয়া এইগুলিও জরুরী বিষয়। কাজেই এই অবস্থা কখনও কখনও সৃষ্টি হইতে পারে সর্বদা নহে। আর সর্বদা সৃষ্টি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও করা চাই না। কেননা ইহা ফেরেশতাদের শান। কারণ তাহাদের অন্য কোন ধান্ধাই নাই, না বিবি বাচ্চা, না রুজি-রোজগারের ফিকির, না দুনিয়ার কোন ঝামেলা। পক্ষান্তরে মানুষের সহিত যেহেতু মানবিক প্রয়োজনসমূহ জড়িত রহিয়াছে সেহেতু তাহারা সর্বদা এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল, সাহাবায়ে কেরামদের স্বীয় দ্বীনের কত ফিকির ছিল যে, সামান্য কারনে অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমাদের যেই অবস্থার সৃষ্টি হইত উহা পরে বহাল থাকে না, এই কারণে নিজের ব্যাপারে মুনাফেক হওয়ার ধারণা হইল।

"عشق است وہزار بدگمانی"

অর্থাৎ কাহারও প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকিলে তাহার সম্বন্ধে নানারকম সন্দেহ ও চিন্তা হয়। আদরের ছেলে সফরে চলিয়া গেলে সবসময় তাহার নিরাপদ থাকার চিন্তা সওয়ার থাকে। আর যদি শুনা যায় যে, সেখানে মহামারী বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিয়াছে তবে তো খোদা জানেন কত চিঠি এবং টেলিফোন পৌছিবে।

পরিশিষ্ট

খোদাভীতির বিভিন্ন অবস্থা

কুরআন শরীফের আয়াত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং বুযুর্গদের ঘটনাবলীতে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সংক্ষেপে এতটুকু জানিয়া রাখা দরকার যে, দ্বীনের সকল পূর্ণতার সিঁড়ি হইল আল্লাহর ভয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হেকমতের মূল উৎস হইতেছে আল্লাহর ভয়। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) খুব ক্রন্দন করিতেন। এমনকি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষুও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একবার কেহ এই অবস্থা দেখিয়া ফেলিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি কি আমার ক্রন্দনে আশ্চর্যবোধ করিতেছ? আল্লাহর ভয়ে সূর্যও ক্রন্দন করে। আরেকবার এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর ভয়ে চাঁদও ক্রন্দন করে।

এক যুবক সাহাবীর নিকট দিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইতেছিলেন। ঐ সাহাবী তেলাওয়াত করিতেছিলেন। যখন فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ এই আয়াতে পৌছিলেন তখন তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় সে বলিতেছিল, হাঁ, যেইদিন আসমান ফাটিয়া যাইবে (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আমার কি অবস্থা হইবে, হায় আমার ধ্বংস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ক্রন্দনের কারণে ফেরেশতারাও ক্রন্দন করিতেছে।

এক আনসারী সাহাবী (রাযিঃ) তাহাজ্জুদ নামায পড়িলেন। অতঃপর বসিয়া অনেক কাঁদিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে ফরিয়াদ করিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ তুমি ফেরেশতাদেরকেও কাঁদাইলে।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) একজন সাহাবী। তিনি একবার ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? স্ত্রী উত্তরে বলিলেন, আপনি যে কারণে কাঁদিতেছেন আমিও সেই কারণে কাঁদিতেছি। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, জাহান্নামের উপর দিয়া তো যাইতে হইবেই, জানিনা নাজাত পাইব নাকি সেখানেই পড়িয়া থাকিব। (কিয়ামুল্লাইল)

যুরারা ইবনে আউফা এক মসজিদে নামায পড়াইতেছিলেন। যখন فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ الاٰية আয়াতে পৌছিলেন তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং মারা গেলেন। লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া মসজিদ হইতে ঘরে পৌছাইয়া দিল।

হযরত খুলাইদ (রহঃ) একবার নামাযে বার বার كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ পড়িতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর ঘরের এক কোণ হইতে আওয়াজ আসিল, তুমি ইহা আর কতবার পড়িবে? তোমার বার বার পড়িবার কারণে চারজন জ্বিন মারা গিয়াছে।

আরেক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তেলাওয়াত করিতে করিতে যখন وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ এই আয়াতে পৌছিলেন তখন তিনি এক চিৎকার দিলেন এবং ছটফট করিতে করিতে মারা গেলেন। এই ধরনের আরো বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর ভয় সকল প্রকার কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে। হযরত শিবলী

(রহঃ)এর নাম সকলেই জানেন। তিনি বলেন, যখনই আমি আল্লাহকে ভয় করিয়াছি তখনই ইহার বদৌলতে আমার সামনে হেকমত ও উপদেশের এমন দরজা খুলিয়াছে যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও খুলে নাই।

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আপন বান্দার উপর দুইটি ভয় একত্র করি না এবং দুইটি নির্ভয় দান করি না। যদি দুনিয়াতে আমার ব্যাপারে নির্ভীক থাকে তবে কেয়ামতের দিন ভয় প্রদর্শন করি আর যদি দুনিয়াতে ভয় করিতে থাকে তবে আখেরাতে নির্ভয় দান করি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে প্রত্যেক বস্তু তাহাকে ভয় করে। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করে তাহাকে প্রত্যেক জিনিস ভয় দেখায়।

ইয়াহয়া ইবনে মুয়ায (রহঃ) বলেন, মানুষ গরীবীকে যে পরিমাণ ভয় করে যদি জাহান্নাম সম্পর্কে সে পরিমাণ ভয় করিত তবে সে সোজা জান্নাতে চলিয়া যাইত।

আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, যেই অন্তর হইতে আল্লাহর ভয় চলিয়া যায় সেই অন্তর বরবাদ হইয়া যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে চক্ষু হইতে আল্লাহর ভয়ে সামান্য পানিও বাহির হয় ; চাই উহা মাছির মাথা পরিমাণই হউক না কেন এবং উহা চেহারার উপর গড়াইয়া পড়ে আল্লাহ তায়ালা ঐ চেহারাকে আগুনের জন্য হারাম করিয়া দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহর ভয়ে যখন মুসলমানের অন্তর কাঁপে তাহার গোনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর এক এরশাদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে তাহার পক্ষে জাহান্নামে যাওয়া এমন অসম্ভব যেমন দুধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব।

উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) নামক জনৈক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, নাজাত এবং মুক্তির পথ কি? তিনি বলিলেন, নিজের জবান সামলাইয়া রাখ, ঘরে বসিয়া থাক এবং আপন গোনাহের জন্য কাঁদিতে থাক। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোন লোক আছে কি? যে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, হাঁ, যে ব্যক্তি নিজের

গোনাহের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে দুইটি ফোঁটা সর্বাধিক পছন্দনীয়। একটি হইল অশ্রুর ফোঁটা যাহা আল্লাহর ভয়ে বাহির হয়। অপরটি রক্তের ফোটা যাহা আল্লাহর পথে ঝরিয়া পড়ে।

এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন সাত প্রকার ব্যক্তি এইরূপ হইবে যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আপন ছায়া দান করিবেন। তন্মধ্যে একজন হইল ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তজ্জন্য চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাঁদিতে পারে সে কাঁদিবে আর যে কাঁদিতে পারে না সে কাঁদিবার ভান করিবে।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (রহঃ) যখন কাঁদিতেন তখন চোখের পানি চেহারায় ও দাড়িতে মুছিতেন এবং বলিতেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌছিয়াছে যে, জাহান্নামের আগুন ঐ জায়গাকে স্পর্শ করে না যেখানে চোখের পানি পৌছিয়াছে।

সাবেত বুনানী (রহঃ) চক্ষু রোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসক বলিল, আপনি যদি একটি ওয়াদা করিতে পারেন তবে আপনার চক্ষু ভাল হইয়া যাইবে। আর তাহা এই যে, আপনি কাঁদিতে পারিবেন না। তখন তিনি বলিলেন, সেই চক্ষুতে কোন সৌন্দর্যই নাই যেই চক্ষু ক্রন্দন করে না।

ইয়াযীদ ইবনে মাইসারা (রহঃ) বলেন, ক্রন্দন সাত কারণে হইয়া থাকে। যথা—(১) খুশীর কারণে, (২) উন্মাদনার কারণে, (৩) ব্যথার কারণে, (৪) ভয়ের কারণে, (৫) দেখানোর উদ্দেশ্যে, (৬) নেশার কারণে, (৭) আল্লাহর ভয়ে। এই শেষোক্তটিই হইল ঐ ক্রন্দন যাহার একটি ফোঁটাও আগুনের সমুদ্রকে নিভাইয়া দেয়।

কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করি এবং চোখের পানি আমার চেহারার উপর প্রবাহিত হয়—ইহা আমার কাছে পাহাড় সমান সোনা আল্লাহর পথে সদকা করার চাইতেও অধিক পছন্দনীয়।

এই ধরনের আরো হাজারো বর্ণনা রহিয়াছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর স্মরণে এবং গোনাহের চিন্তায় ক্রন্দন করা পরশমণি তুল্য। আর অত্যন্ত জরুরী এবং উপকারী। আপন গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অবস্থাই সৃষ্টি হওয়া চাই তবে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী ও তাহার রহমতের আশায়ও ত্রুটি না হওয়া চাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত প্রত্যেক জিনিসকে বেষ্টন করিয়া আছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর উক্তি বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন যদি এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, কেবল এক ব্যক্তি ছাড়া সকলকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইয়া দাও, তবে আমি আল্লাহর রহমত হইতে এই আশা করিব যে, ঐ এক ব্যক্তি আমিই হইব। আর যদি এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তি ছাড়া সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দাও। তবে আমার স্বীয় আমলের ব্যাপারে এই ভয় রহিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি আমিই না হইয়া যাই।

অতএব উভয় বিষয়কে পৃথকভাবে বুঝা ও পৃথক রাখা চাই। বিশেষতঃ মৃত্যুর সময় রহমতের আশা বেশী হওয়া উচিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর ইন্তিকালের সময় হইলে তিনি নিজ ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে ঐ সমস্ত হাদীস পড়িয়া শুনাও যেগুলি দ্বারা আল্লাহর প্রতি আশা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও দরিদ্রতার বর্ণনা

এই বিষয়ে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল ও ঘটনাবলীর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই বিষয়টি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বেচ্ছায় গ্রহণ ও পছন্দ করা বিষয় ছিল। এই বিষয়ে হাদীসের কিতাবসমূহে এত অধিক সংখ্যক ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে, যেগুলি নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করাও দুস্কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দরিদ্রতা মুমেনের উপঢৌকন।

(১) পাহাড়সমূহকে স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে হুযূর (সাঃ)-এর অস্বীকৃতি

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার রব আমার নিকট এই প্রস্তাব রাখিয়াছেন যে, মক্কার পাহাড়সমূহকে আমার জন্য সোনায় পরিণত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহ! আমার কাছে ইহাই পছন্দনীয় যে, একদিন পেট ভরিয়া আহার করিব আরেক দিন ক্ষুধার্ত থাকিব। যখন ক্ষুধার্ত থাকিব তখন আপনার

দরবারে কান্নাকাটি ও কাকুতি মিনতি করিব আর আপনাকে স্মরণ করিব। আর যখন পেট পূর্ণ করিয়া আহার করিব তখন আপনার শোকরিয়া আদায় করিব এবং আপনার প্রশংসা করিব। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ইহা সেই পবিত্র ব্যক্তির অবস্থা আমরা যাহার নাম লইয়া থাকি, যাহার উম্মত হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিয়া থাকি এবং যাহার প্রত্যেকটি কাজ আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

(২) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সচ্ছলতা কামনার দরুন তাহাকে সতর্ক করা ও হুযূর (সাঃ)-এর জীবিকা নির্বাহের অবস্থা

একবার স্ত্রীগণের কিছু বাড়াবাড়ির কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম করিয়াছিলেন যে, একমাস পর্যন্ত তাঁহাদের কাছে যাইবেন না, যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া যান। অতএব তিনি উপরে একটি পৃথক হুজরায় অবস্থান করিয়াছিলেন। লোকজনের মধ্যে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তখন নিজ ঘরে ছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন। মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, লোকজন বিভিন্ন জায়গায় বসিয়া আছে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোস্বা ও মনক্ষুন্নতার কারণে তাহারা কাঁদিতেছে। বিবিগণও নিজ নিজ ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) আপন কন্যা হযরত হাফসা (রাযিঃ)এর ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এখন কাঁদিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে সর্বদা সাবধান করি নাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টিজনক কোন কাজ করিবে না। অতঃপর মসজিদে আসিলেন। সেখানে মিম্বরের কাছে একদল লোক বসিয়া কাঁদিতেছিল। কিছুক্ষণ তিনি সেখানে বসিয়াছিলেন কিন্তু অত্যধিক চিন্তার দরুন বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেখান হইতে উঠিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হুজরায় অবস্থানরত ছিলেন উহার নিকট আসিলেন এবং হযরত রাবাহ নামক গোলামের নিকট যিনি হুজরার সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তিনি খেদমতে হাজির হইয়া হযরত ওমর (রাযিঃ)এর জন্য অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। হযরত রাবাহ আসিয়া হযরত ওমর (রাযিঃ)এর নিকট ইহাই বলিলেন যে, আমি আপনার কথা বলিয়াছি কিন্তু কোন উত্তর দেন নাই। হযরত ওমর

(রাযিঃ) নিরাশ হইয়া মিম্বরের কাছে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু বসিতে পারিলেন না, কিছুক্ষণ পর আবার হযরত রাবাহ–এর মাধ্যমে অনুমতি চাহিলেন। এইভাবে তিনবার হইল। একদিকে অস্থিরতার কারণে গোলামের মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি চাহিতেছেন আর অপরদিক হইতে উত্তরে শুধু নিরবতা। তৃতীয় বার যখন ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন তখন হযরত রাবাহ ডাকিয়া বলিলেন, আপনাকে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) খেদমতে হাজির হইয়া দেখিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর শায়িত আছেন। উহার উপর কোন কিছু বিছানো নাই। খালি চাটাইয়ে শুইবার কারণে দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। সুন্দর শরীরে দাগ স্পষ্টরূপেই দেখা যায়। শিয়রে খেজুরের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ ছিল। (হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন,) আমি সালাম করিয়া সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বিবিদেরকে তালাক দিয়াছেন কি? উত্তরে বলিলেন, না। ইহার পর আমি সান্ত্বনাস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোরাইশী পুরুষেরা মহিলাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতাম, কিন্তু যখন মদীনায় আসিলাম তখন দেখিতে পাইলাম আনসারী মহিলারা পুরুষদের উপর প্রভাব খাটায়। ইহাদের দেখাদেখি কোরাইশী মহিলারাও এরূপ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আমি আরো কিছু কথা বলিলাম যাহার ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় হাসির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। আমি দেখিলাম ঘরে মোট সামান এই ছিল যে, তিনটি কাঁচা চামড়া ও এক মুষ্টি যব যাহা এক কোণে পড়িয়াছিল। আমি এদিক সেদিক তাকাইয়া দেখিলাম এইগুলি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ইহাতে আমার কান্না আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদিতেছ কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাঁদিব না কেন? আপনার শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়িতেছে আর আপনার ঘরের মোট আসবাব এই যাহা আমি দেখিতেছি। অতঃপর আরজ করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন, যেন আপনার উম্মত সচ্ছলতা লাভ করে। এই রোম ও পারস্য যাহারা আল্লাহর এবাদত করে না, বেদ্বীন হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য এত প্রাচুর্য। এই কায়সার–কেসরা বাগ–বাগিচা ও নহরের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে আর আপনি আল্লাহর রাসূল তাহার খাছ বান্দা হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই অবস্থা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া শুইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর এই কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, ওমর! এখনও কি তুমি এই ব্যাপারে সন্দেহে পড়িয়া আছ? শোন, আখেরাতের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য দুনিয়ার সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বহু উত্তম। এই কাফেরদের উত্তম খাবার এবং সুখ–সম্ভার দুনিয়াতেই তাহারা পাইয়া গিয়াছে। আর আমাদের জন্য আখেরাতে সঞ্চিত রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যিই আমি ভুল করিয়াছি, আমার জন্য ইস্তেগফার করুন।(ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ এই হইল দ্বীন দুনিয়ার বাদশাহ আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনধারা। চাটাইয়ের উপর কোন চাদর বিছানো নাই, শরীরের উপর দাগ পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্রের অবস্থাও জানা হইয়াছে। তদুপরি এক ব্যক্তি দোয়ার দরখাস্ত করিলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর কাছে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনার ঘরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, একটি চামড়ার বিছানা ছিল উহাতে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিল। হযরত হাফসা (রাঃ)এর কাছেও কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঘরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, একটি চট ছিল। উহা দুই ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিতাম। একদিন মনে করিলাম যদি চার ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিই তাহা হইলে বেশী নরম হইবে। এই ভাবিয়া চার ভাঁজ করিয়া দিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ রাত্রে কি বিছাইয়াছিলে? আমি বলিলাম, ঐ চটই ছিল যাহা চার ভাঁজ করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, পূর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপই করিয়া দাও। ইহার কোমলতা রাত্রিজাগরণে বাধা সৃষ্টি করে। (শামায়েল)

এখন আমরা আমাদের নরম নরম এবং তুলার তৈরী তোষকসমূহের প্রতিও দেখি, আল্লাহ তায়ালা কত সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য দান করিয়াছেন ইহার পরও শোকরিয়ার পরিবর্তে সর্বদা মুখে অভাবেরই অভিযোগ চলিতে থাকে।

(৩) হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) একবার কাতানের কাপড় দ্বারা নাক পরিস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আবু হুরাইরার কথা আর কি বলিব,

সে আজ কাতানের কাপড় দ্বারা নাক পরিস্কার করিতেছে! অথচ আমার ঐ দিনের কথা স্মরণ আছে যখন আমি (আবু হুরাইরা) বেহুঁশ হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর এবং হুজরার মাঝখানে পড়িয়া থাকিতাম। আর লোকেরা পাগল মনে করিয়া পা দ্বারা আমার গর্দান মাড়াইত। অথচ মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল না বরং উহা ছিল ক্ষুধার কারণে।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ একাধারে কয়েকদিন অনাহারে থাকার কারণে অজ্ঞান হইয়া যাইতেন। আর লোকেরা মনে করিত পাগল হইয়া গিয়াছে। বলা হয় সেই যুগে পাগলের চিকিৎসা পা দ্বারা গর্দান মাড়াইয়া করা হইত। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং অল্পেতুষ্ট লোকদের মধ্যে ছিলেন। একাধারে কয়েক দিন না খাইয়া থাকিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আল্লাহ তায়ালা চতুর্দিকে বিজয় দিলেন তখন তাঁহার সচ্ছলতা আসে। তিনি বড় আবেদও ছিলেন। তাঁহার কাছে একটি থলি ছিল। উহাতে খেজুরের দানা ভর্তি থাকিত। ঐগুলির সাহায্যে তসবীহ পড়িতেন। যখন উহা সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইত তখন বাঁদী আবার উহাকে ভরিয়া তাঁহার কাছে রাখিয়া দিত। তাঁহার ইহাও নিয়ম ছিল যে, তিনি নিজে, স্ত্রী ও খাদেম এই তিনজনের মধ্যে রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া নিতেন এবং পালাক্রমে তিনজনের মধ্য হইতে একজন ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। (তাযকেরাতুল-হুফ্‌ফাজ) আমি (অর্থাৎ লেখক) আমার আব্বাজানের কাছে শুনিয়াছি, আমার দাদাজীরও প্রায় এই নিয়ম ছিল। রাত্রি ১টা পর্যন্ত আমার আব্বাজান কিতাব মুতালায়া (অধ্যয়ন) করিতেন। ১টার সময় দাদাজান তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হইতেন। তখন তিনি তাগিদ করিয়া আব্বাজানকে শোয়াইয়া দিতেন। আর নিজে তাহাজ্জুদে মশগুল হইয়া যাইতেন। রাত্র প্রায় পৌনে এক ঘন্টা বাকী থাকিতে আমার চাচাজানকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাইতেন। আর তিনি সুন্নতের অনুসরণ হিসাবে আরাম করিতেন। (হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাঁহাদেরকে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।)

⑧ হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর বাইতুল মাল হইতে ভাতা গ্রহণ

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাপড়ের ব্যবসা করিতেন এবং ইহা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী সকালবেলা কয়েকটি চাদর হাতে লইয়া বিক্রয় করার জন্য বাজারের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিত

সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছেন? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, বাজারে যাইতেছি। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি যদি ব্যবসায় মশগুল হইয়া যান তবে খেলাফতের কাজ চলিবে কিভাবে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, তাহা হইলে পরিবার পরিজনকে খাওয়াইব কোথা হইতে? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আবু উবাইদার কাছে চলুন, যাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' উপাধি দিয়াছেন। তিনি আপনার জন্য বাইতুল মাল হইতে কিছু নির্ধারণ করিয়া দিবেন। উভয়ে তাঁহার নিকট গেলেন। তিনি একজন মুহাজির সাধারণভাবে যে পরিমাণ ভাতা পাইত—বেশীও নয়, কমও নয়—সেই পরিমাণ তাঁহার জন্য নির্ধারণ করিয়া দিলেন।

একবার তাঁহার স্ত্রী আবেদন করিলেন, কিছু মিষ্টি জিনিস খাইতে মন চাহিতেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, আমার কাছে তো খরিদ করার মত পয়সা নাই। স্ত্রী বলিলেন, আমাদের দৈনন্দিন খোরাক হইতে কিছু কিছু করিয়া বাঁচাইয়া রাখিব। কয়েক দিন পর ঐ পরিমাণ হইয়া যাইবে। তিনি অনুমতি দিয়া দিলেন। স্ত্রী কয়েকদিনে অল্প পয়সা জমা করিলেন। তিনি বলিলেন, বুঝা গেল এই পরিমাণ মাল বাইতুল মাল হইতে আমরা অতিরিক্ত গ্রহণ করিতেছি। এই জন্য স্ত্রী যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন উহাও বাইতুল মালে জমা করিয়া দিলেন এবং আগামীর জন্য নিজের ভাতা হইতে ঐ পরিমাণ কমাইয়া দিলেন যেই পরিমাণ তাঁহার স্ত্রী দৈনিক জমা করিয়াছিলেন।

ফায়দা ঃ এত বড় খলীফা এবং বাদশাহ যিনি পূর্ব হইতে নিজের ব্যবসাও করিতেন আর উহা জীবিকার জন্য যথেষ্টও ছিল। যেমন বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যখন খলীফা নিযুক্ত হইলেন তখন বলিলেন যে, আমার কওমের লোকেরা জানে, আমার ব্যবসা আমার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন খেলাফতের কারণে আমি মুসলমানদের কাজে ব্যস্ত হইয়াছি অতএব আমার পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া বাইতুল মাল হইতে নির্ধারিত হইবে। এতদসত্ত্বেও যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর ইন্তিকাল হইতে লাগিল তখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে ওসিয়ত করিলেন যে, বাইতুল মাল হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আমার কাছে রহিয়াছে সেইগুলি যেন আমার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার নিকট অর্পণ করিয়া দেওয়া হয়।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, তাঁহার কাছে কোন দীনার-দেরহাম ছিল না। একটি দুধের উটনী, একটি পেয়ালা, একজন খাদেম, কোন কোন বর্ণনায় একটি চাদর ও একটি বিছানার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্তীকালে এই সমস্ত জিনিস স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে যখন হযরত ওমর (রাযিঃ)এর কাছে পৌছিল তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু বকর (রাযিঃ)এর প্রতি রহম করুন, তিনি পরবর্তীদেরকে কষ্টে ফেলিয়া গেলেন। (ফাতহুল বারী)

(৫) হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর বাইতুল মাল হইতে ভাতা

হযরত ওমর (রাযিঃ)ও ব্যবসা করিতেন। যখন খলীফা নিযুক্ত হন তখন বাইতুল মাল হইতে ভাতা নির্ধারণ করা হয়। তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় লোকজনকে সমবেত করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, আমি ব্যবসা করিতাম। এখন তোমরা আমাকে খেলাফতের কাজে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছ। এখন আমার জীবিকা নির্বাহের কি ব্যবস্থা হইবে। লোকেরা বিভিন্ন পরিমাণ উল্লেখ করিল। হযরত আলী (রাযিঃ) নীরব বসিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার কি রায়। তিনি বলিলেন, মধ্যম পর্যায়ে নির্ধারণ করা হউক যাহা আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের জন্য যথেষ্ট হয়। হযরত ওমর (রাযিঃ) এই রায় পছন্দ করিলেন এবং গ্রহণ করিয়া লইলেন এবং মধ্যম পর্যায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইল। উহার পর একবার এক মজলিসে যেখানে হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত ওসমান (রাযিঃ), হযরত যুবাইর (রাযিঃ) ও হযরত তালহা (রাযিঃ) উপস্থিত ছিলেন আলোচনা হইল যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ভাতা আরো বৃদ্ধি করা চাই। কারণ, যে পরিমাণ ভাতা দেওয়া হয় উহাতে জীবন ধারণ কষ্টকর হয়। কিন্তু তাঁহার কাছে আরজ করিতে সাহস হইল না। তাই তাঁহার কন্যা হযরত হাফসা (রাযিঃ) যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হওয়ার কারণে উম্মুল মুমিনীন ছিলেন তাঁহার খেদমতে গেলেন এবং তাঁহার মাধ্যমে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর রায় ও অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমাদের নাম যেন জানিতে না পারেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ) যখন হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর কাছে এই বিষয় আলোচনা করিলেন তখন তাঁহার চেহারায় গোস্‌সার আলামত পরিলক্ষিত হইল। হযরত ওমর (রাযিঃ) নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ) বলিলেন, প্রথমে আপনার অভিমত জানা হউক। হযরত ওমর

(রাযিঃ) বলিলেন, আমি যদি তাহাদের নাম জানিতে পারিতাম তবে তাহাদের চেহারা বিকৃত করিয়া দিতাম অর্থাৎ এমন শাস্তি দিতাম যাহার ফলে চেহারায় দাগ পড়িয়া যাইত। তুমিই বল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম পোশাক তোমার ঘরে কি ছিল? তিনি বলিলেন, গেরুয়া রংয়ের দুইটি কাপড় যাহা জুমআর দিন অথবা কোন প্রতিনিধি দল আসিলে পরিধান করিতেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে সর্বোত্তম খানা কি খাইয়াছেন? আরজ করিলেন, আমাদের খাদ্য ছিল যবের রুটি। একবার আমি গরম রুটিতে ঘিয়ের কৌটার তলানী উপুড় করিয়া লাগাইয়া দিলাম তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তৃপ্তি সহকারে খাইতেছিলেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়াইতেছিলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্বোত্তম বিছানা কি ছিল যাহা তোমার ঘরে বিছানো হইত? তিনি বলিলেন, একটি মোটা কাপড় ছিল যাহা গরম কালে চার ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া নিতেন আর শীতকালে উহার অর্ধেক বিছাইতেন আর অর্ধেক গায়ে দিতেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, হে হাফসা, তুমি তাহাদেরকে এই কথা পৌছাইয়া দাও যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন এবং (আখেরাতের) আশায় সন্তুষ্ট থাকিয়াছেন। আমিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিব। আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয় অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর উদাহরণ ঐ তিন ব্যক্তির ন্যায় যাহারা একই রাস্তায় চলিল। প্রথম ব্যক্তি একটি পাথেয় লইয়া রওয়ানা হইয়াছে এবং মঞ্জিলে পৌছিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়জনও প্রথমজনের অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহারই তরীকায় চলিয়াছে, সেও প্রথম ব্যক্তির নিকট পৌছিয়া গিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি চলিতে শুরু করিয়াছে যদি এই ব্যক্তি তাহাদের দুইজনের অনুসরণ করে তবে সেও তাহাদের সাথে যাইয়া মিলিত হইবে আর যদি তাহাদের অনুসরণ না করে তবে তাহাদের সহিত কখনও মিলিত হইতে পারিবে না। (আশহার)

ফায়দা ঃ ইহা এমন এক ব্যক্তির অবস্থা যাহার ভয়ে দুনিয়ার অন্য বাদশাহরা পর্যন্ত ভীত ও কম্পিত হইত। অথচ তিনি কিরূপ সাদাসিধা জীবন যাপন করিয়াছেন! একবার তিনি খুতবা পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার লুঙ্গিতে বারটি তালি লাগানো ছিল তন্মধ্যে একটি তালি চামড়ারও ছিল। একবার জুমআর নামাযে আসিতে দেরী হইলে তিনি উহার কারণ

বর্ণনা করিলেন যে, আমার কাপড় ধৌত করিতে দেরী হইয়াছে আর এই কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড় ছিল না। (আশহার)

একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) খানা খাইতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার গোলাম আসিয়া বলিল, উতবা ইবনে আবি ফারকাদ আসিয়াছেন। তিনি ভিতরে আসার অনুমতি দান করিলেন এবং খানা খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি খাওয়ায় শরীক হইলেন কিন্তু এত মোটা রুটি ছিল যে, গিলিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, চালা আটার রুটিও তো হইতে পারিত। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সমস্ত মুসলমানই কি ময়দার রুটি খাইবার সামর্থ্য রাখে? উতবা (রাযিঃ) বলিলেন, না সবাই সামর্থ্য রাখে না। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আফসোস! তুমি কি চাও যে, আমি সমস্ত স্বাদ দুনিয়াতেই ভোগ করিয়া ফেলি? (উসদুল–গাবাহ্)

এই ধরনের শত সহস্র নয় লাখো ঘটনা এই সমস্ত বুযুর্গের রহিয়াছে। এই যামানায় না তাহাদের অনুসরণ করা সম্ভব আর না প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সমীচীন। কেননা, শারীরিক দুর্বলতার কারণে এই যামানায় তাহাদের মত কষ্ট সহ্য করা কঠিন। এই জন্যই বর্তমান যুগে তাসাউফের মাশায়েখগণ এমন মুজাহাদার অনুমতি দেন না যাহার ফলে দুর্বলতা পয়দা হয়, কেননা এমনিই তো দুর্বল। ঐ সমস্ত বুযুর্গকে আল্লাহ তায়ালা শক্তিও দান করিয়াছিলেন। তবে তাহাদের অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহ থাকা অত্যন্ত জরুরী। ইহাতে আরামপ্রিয়তা কিছুটা কমিয়া যাইবে এবং দৃষ্টি নীচু থাকিবে এবং বর্তমান যুগোপযোগী মধ্যম পন্থায় মুজাহাদা করার অভ্যাস পয়দা হইবে। কারণ, আমরা সবসময় দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতায় অগ্রগামী হইতেছি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চেয়ে অধিক সম্পদশালী লোকের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছি, আর এই আক্ষেপে মরিতেছে যে, অমুক ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী।

(৬) হযরত বিলাল (রাযিঃ) কর্তৃক হুযূর (সঃ)–এর জন্য এক মুশরেকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ

হযরত বিলাল (রাযিঃ)–এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খরচপত্রের কি ব্যবস্থা হইত? তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছুই জমা থাকিত না। এই দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ব্যবস্থা এই ছিল যে, কোন ক্ষুধার্ত মুসলমান আসিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মেহমানদারীর কথা বলিতেন। আমি কোথাও হইতে ঋণ করিয়া

তাহার খানাপিনার ব্যবস্থা করিতাম। কোন বস্ত্রহীন আসিলে আমাকে আদেশ করিতেন আমি কাহারো নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহার বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতাম। এইভাবেই চলিতে থাকিত।

একবার জনৈক মুশরেকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হইলে সে আমাকে বলিল, আমার তো আর্থিক সচ্ছলতা আছে। অতএব তুমি অন্য কাহারো নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ না করিয়া প্রয়োজন হইলে আমার নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করিও। আমি মনে মনে ভাবিলাম, ইহার চাইতে উত্তম আর কি হইতে পারে। অতএব তাহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে শুরু করিলাম। যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম হইত তাহার নিকট হইতে ঋণ লইয়া হুকুম পুরা করিতাম।

একদিন আমি ওযু করিয়া আযান দেওয়ার জন্য মাত্র দাঁড়াইয়াছিলাম। ঐ মুশরিক একদল লোক সহ আসিয়া বলিতে লাগিল, ওহে হাবশী! আমি তাহার দিকে তাকাইতেই সে উত্তেজিত হইয়া গালিগালাজ করিতে শুরু করিল এবং ভালমন্দ যাহা মুখে আসিল বলিল। আর বলিতে লাগিল যে, মাস শেষ হইতে আর কতদিন বাকী আছে? আমি বলিলাম, প্রায় শেষ হওয়ার পথে। সে বলিল, আর মাত্র চার দিন বাকী আছে, মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করিলে তোকে পূর্বের ন্যায় আমার ঋণের বিনিময়ে গোলাম বানাইয়া লইব। আর পূর্বের ন্যায় বকরী চরাইয়া বেড়াইবি। এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমার উপর সারাদিন যে অবস্থায় কাটিবার কাটিয়াছে। সারাদিন দুঃখ ও বেদনায় মন ভারী হইয়া রহিল। ইশার নামাযান্তে আমি নির্জনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না আপনার কাছে এই সময় ঋণ আদায়ের কোন তড়িৎ ব্যবস্থা আছে আর না আমি এত তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব। সে তো অপমান করিবে, কাজেই ঋণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাকে আত্মগোপন করিয়া থাকার অনুমতি দিন। যখন আপনার নিকট কোথাও হইতে কিছু আসিয়া যাইবে তখন আমি হাজির হইয়া যাইব। এই বলিয়া আমি ঘরে আসিয়া পড়িলাম এবং ঢাল তরবারী ও জুতা লইলাম, এইগুলিই সফরের সামান ছিল। ভোরের অপেক্ষা করিতেছিলাম, ভোর হইতেই কোথাও চলিয়া যাইব। ভোর হইতে বেশী দেরী ছিল না এমন সময় জনৈক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে চল। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তখন দেখিলাম যে, মাল বোঝাই করা চারটি উটনী বসিয়া আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে খুশীর কথা শুনাইব কি? আল্লাহ তায়ালা তোমার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই উটনীসমূহ মালামালসহ তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম। আমার জন্য ফাদাকের সরদার হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছে। আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিলাম এবং আনন্দের সাথে এইগুলি লইয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিলাম। এদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অপেক্ষমান ছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, হুযূর! আল্লাহর শোকরিয়া আল্লাহ তায়ালা আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন, সামান্য ঋণও বাকী নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সামান হইতে কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে কি? আমি বলিলাম, কিছু বাকী রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, ইহাও বন্টন করিয়া দাও, যাহাতে আমার শান্তি লাভ হয় ; যতক্ষণ ইহা বন্টন না হইয়া যাইবে ততক্ষণ আমি ঘরেও যাইব না। সারাদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে ইশার নামাযের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, অবশিষ্ট মাল বন্টন হইয়াছে কিনা? আমি বলিলাম, কিছু বাকী রহিয়াছে। কোন অভাবগ্রস্ত লোক আসে নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদেই আরাম করিলেন। পরদিন এশার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বল কিছু বাকী আছে কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আরাম ও স্বস্তি দান করিয়াছেন। সম্পূর্ণ মাল বন্টন হইয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিলেন। তিনি এই আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, নাজানি আমার মৃত্যু আসিয়া যায় আর কিছু মাল আমার মালিকানাধীন থাকিয়া যায়। অতঃপর তিনি ঘরে যাইয়া বিবিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। (বযলুল মজহুদ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ সর্বদা ইহাই কামনা করেন যে, তাহাদের মালিকানাধীন যেন কোন সম্পদ না থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সমস্ত নবীদের সরদার এবং ওলীকুল শিরমনি ছিলেন। তিনি এই কামনা কেন করিবেন না যে, আমি দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া যাই।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)-এর এই অভ্যাস ছিল যে, তাঁহার নিকট যখন হাদিয়ার টাকা কিছু জমা হইয়া যাইত তখন গুরুত্বসহকারে সেইগুলি আনাইয়া

সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিতেন। মৃত্যুর পূর্বে পরণের কাপড়-চোপড়ও আপন বিশেষ খাদেম হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের (রহঃ)কে দান করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এখন তোমার নিকট হইতে ধার করিয়া পরিধান করিব। এমনিভাবে আমার মরহুম পিতা (হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)কে একাধিক বার দেখিতে পাইয়াছি, মাগরিবের পর তাঁহার কাছে যাহা কিছু টাকা পয়সা থাকিত তাহা কোন পাওনাদারকে দিয়া দিতেন। কেননা তিনি কয়েক হাজার টাকার ঋণগ্রস্ত ছিলেন। আর তিনি বলিতেন, ইহা ঝগড়ার বস্তু। রাত্রে আমার নিকট রাখিব না।

এই ধরনের আরো বহু ঘটনা বুযুর্গদের সম্পর্কে রহিয়াছে। তবে প্রত্যেক বুযুর্গের একই অবস্থা হওয়া জরুরী নহে। বুযর্গদের অবস্থা ও রং বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। বাগানের সব ফুল এক রকম হয় না। এক এক ফুল তাহার রং ও গন্ধে অপরটি হইতে পৃথক ও অনন্য হইয়া থাকে।

(৭) হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)-এর ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাসআলা জিজ্ঞাসা করা

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, তোমরা যদি ঐ সময় আমাদের অবস্থা দেখিতে যে, আমাদের মধ্যে কাহারো কাহারো কয়েক বেলা পর্যন্ত এই পরিমাণ খাবার জুটিত না যাহা দ্বারা কোমর সোজা হইতে পারে। আমি ক্ষুধার তাড়নায় জমিনের সহিত কলিজা লাগাইয়া রাখিতাম, কখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, আবার কখনও পেটে পাথর বাঁধিয়া লইতাম।

একবার আমি যাতায়াতের পথে বসিয়া গেলাম। প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) গমন করিলেন। আমি তাহাকে কোন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কথা বলিতে বলিতে ঘরে লইয়া যাইবেন অতঃপর অভ্যাস অনুযায়ী ঘরে যাহা থাকে মেহমানদারী করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না (সম্ভবতঃ ঐ দিকে তাঁহার খেয়াল যায় নাই অথবা তিনি নিজের ঘরের অবস্থা জানিতেন যে, সেখানেও কিছু নাই)। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) আসিলেন। তাহার সাথেও একই অবস্থা হইল। অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং আমাকে দেখিয়া মুচকি হাসিলেন। আমার উদ্দেশ্য এবং অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বলিলেন, আবু হুরাইরা! আমার সাথে আস। আমি তাঁহার সঙ্গী হইয়া

গেলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও অনুমতি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে এক পেয়ালা দুধ রাখা ছিল। উহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে। উত্তরে বলা হইল, অমুক জায়গা হইতে আপনার জন্য হাদিয়া আসিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু হুরাইরা! যাও আহলে সুফ্‌ফাকে ডাকিয়া আন। আহলে সুফ্‌ফা ইসলামের মেহমান হিসাবে গণ্য হইতেন। তাঁহাদের না কোন ঘরবাড়ী ছিল, না কোন ঠিকানা আর না ছিল খাওয়া-দাওয়ার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। তাঁহাদের সংখ্যা কম-বেশ হইতে থাকিত। তবে এই সময় তাঁহাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে দুই দুই, চার চার জনকে কখনও কখনও কোন সচ্ছল সাহাবীর মেহমান বানাইয়া দিতেন। আর তাঁহার নিজের অভ্যাস এই ছিল যে, কোথাও হইতে সদকা আসিলে উহা তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং নিজে উহাতে অংশগ্রহণ করিতেন না। আর যদি কোথাও হইতে হাদিয়া আসিত তবে উহাতে তাঁহাদের সহিত তিনি নিজেও শরীক হইতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের সবাইকে ডাকিতে বলিলেন। ইহা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হইল। কেননা এই দুধের পরিমানই বা কতটুকু যে সকলকে ডাকিয়া আনিব। সকলের জন্য কি হইবে একজনের জন্যও তো যথেষ্ট হওয়া মুশকিল হইবে। আর ডাকিয়া আনার পর আমাকেই পান করানোর নির্দেশ দেওয়া হইবে, যাহার ফলে আমার পালাও আসিবে সবার শেষে। তখন আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করা ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল। তাই আমি গেলাম এবং সকলকে ডাকিয়া আনিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লও সকলকে পান করাও। আমি এক একজনের হাতে পেয়ালা দিতাম আর সে খুব তৃপ্তি মিটাইয়া পান করিত এবং আমাকে পেয়ালা ফেরত দিত। এমনিভাবে সকলকে পান করাইলাম, সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গেলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি নিজ হাতে লইয়া আমার প্রতি দেখিলেন এবং মুচকি হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন, এখন তো আমি আর তুমিই বাকী আছি। আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, লও পান কর। আমি পান করিলাম। বলিলেন, আরো পান কর। আমি আরো পান করিলাম। অবশেষে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি আর পান করিতে

পারিতেছি না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অবশিষ্ট সবটুকু পান করিয়া নিলেন।

(৮) হুযূর (সঃ)এর সাহাবায়ে কেরামের নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কতিপয় লোক উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গমন করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন সম্ভ্রান্ত লোক, আল্লাহর কসম সে এমন যোগ্য লোক যে, যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে, কাহারো সুপারিশ করিলে উহা মঞ্জুর হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া চুপ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গমন করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তি সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রশ্ন করিলেন। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন গরীব মুসলমান, কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলে কেহ বিবাহ দিবে না; কোথাও সুপারিশ করিলে উহা মঞ্জুর হইবে না; কথা বলিলে কেহ কর্ণপাত করিবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত লোক দ্বারা যদি সমস্ত দুনিয়া ভরিয়া যায় তবু তাহাদের সকলের চাইতে এই ব্যক্তি উত্তম।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ নিছক দুনিয়াবী মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন মূল্যই রাখে না। একজন গরীব মুসলমান যাহার দুনিয়াতে কোনই মর্যাদা নাই যাহার কথা কোথাও গ্রাহ্য করা হয় না এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঐ সকল শত শত মর্যাদাবান লোকদের অপেক্ষা উত্তম যাহাদের কথা দুনিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাদের কথা শুনিতে এবং মানিতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাহাদের কোন মূল্য নাই। আল্লাহওয়ালাদের বরকতেই দুনিয়া টিকিয়া আছে। হাদীস শরীফে আছে, যেদিন দুনিয়াতে আল্লাহর নাম লওয়ার মত কেহ থাকিবে না সেদিন কেয়ামত ঘটিয়া যাইবে এবং দুনিয়ার অস্তিত্বই শেষ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামেরই বরকত যে, দুনিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনা কায়েম রহিয়াছে।

(৯) হুযূর (সঃ)-এর সহিত মহব্বতকারীদের দিকে দরিদ্রতা ধাবিত হওয়া

জনৈক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালবাসি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ভাবিয়া দেখ কি বলিতেছ। সে পুনরায় একই কথা আরজ করিল যে, আমি আপনাকে ভালবাসি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই উত্তর দিলেন। তিনবার এইরূপ প্রশ্নোত্তর হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি আপন দাবীতে সত্যবাদী হও তবে দারিদ্র্যের চাদর পরিধান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। কেননা যাহারা আমাকে ভালবাসে দরিদ্রতা তাহাদের দিকে এমন বেগে ধাবিত হয় যেমন নিম্নভূমির দিকে পানির স্রোত ধাবিত হয়।

ফায়দা ঃ এইজন্যই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) অধিকাংশ সময় অভাব-অনটন ও উপবাস অবস্থায়ই কাটাইয়াছেন। বড় বড় মুহাদ্দিস, সুফি ও ফকীহগণও খুব বেশী সচ্ছলতায় জীবন-যাপন করেন নাই।

(১০) আম্বর অভিযানে অভাব-অনটনের অবস্থা

৮ম হিজরীর রজব মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্র উপকূলে তিনশত লোকের একটি বাহিনী পাঠাইলেন। যাহাদের উপর হযরত আবূ উবায়দা (রাযিঃ)কে আমীর নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি থলির মধ্যে রসদস্বরূপ কিছু খেজুরও তাহাদেরকে দিলেন। তাহারা পনের দিন সেখানে অবস্থান করিলেন এবং রসদ ফুরাইয়া গেল উক্ত কাফেলার মধ্যে হযরত কায়েস (রাযিঃ) ছিলেন, তিনি মদীনায় ফিরিবার পর মূল্য আদায় করিবার ওয়াদা করিয়া কাফেলার সাথীদের নিকট হইতে উট খরিদ করিয়া জবাই করিতে শুরু করিলেন। প্রতিদিন তিনটি করিয়া উট জবাই করিতেন কিন্তু তৃতীয় দিন কাফেলার আমীর এই ভাবিয়া যে, সওয়ারী শেষ হইয়া গেলে ফিরিয়া যাওয়া কষ্টকর হইয়া যাইবে।

উট জবাই করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং সকলের নিকট তাহাদের নিজেদের যে পরিমাণ খেজুর মওজুদ ছিল তাহা একত্র করিয়া একটি থলিতে রাখিলেন এবং দৈনিক এক একটি করিয়া খেজুর বন্টন করিয়া দিতেন। যাহা চুষিয়া তাহারা পানি পান করিয়া লইতেন এবং রাত পর্যন্ত ইহাই তাহাদের খাবার ছিল। বলিতে তো সহজ কিন্তু যুদ্ধের

ময়দানে যেখানে শক্তি সামর্থ্যেরও প্রয়োজন রহিয়াছে সেখানে একটি খেঁজুরের উপর সারাদিন কাটাইয়া দেওয়া অত্যন্ত দিল গুর্দার ব্যাপার। সুতরাং হযরত যাবের (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার পর যখন এই ঘটনা লোকদেরকে শুনাইলেন, তখন জনৈক শাগরেদ জিজ্ঞাসা করিল যে, একটি খেজুর দ্বারা কি হইত। তিনি বলিলেন, একটি খেজুরের মূল্য তখন বুঝে আসিল যখন একটি খেজুরও থাকিল না। তখন ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া আর উপায় রহিল না। গাছের শুকনা পাতা ঝাড়িয়া পানিতে ভিজাইয়া খাইয়া লইতাম। অসহায় অবস্থা মানুষকে সবকিছু করিতে বাধ্য করে এবং প্রত্যেক কষ্টের পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে সহজ ব্যবস্থা হয়। এই সকল দুঃখ ও কষ্টের পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে সহজ ব্যবস্থা হয়। এই সকল দুঃখ ও কষ্টের পর আল্লাহ তায়ালা সমুদ্র হইতে তাহাদের নিকট আম্বর নামক একটি মাছ পৌছাইয়া দিলেন। মাছটি এত বড় ছিল যে, আঠার দিন পর্যন্ত তাহারা উহা হইতে খাইতে থাকিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা পৌছা পর্যন্ত উহার গোশত রসদ স্বরূপ তাহাদের সঙ্গে ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যখন সফরের বিস্তারিত ঘটনা বলা হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি রিযিক ছিল যাহা তোমাদের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

ফায়দা ঃ দুঃখকষ্ট এবং বিপদ-আপদ এই দুনিয়ার অবিচ্ছেদ্য বিষয়। বিশেষ করিয়া আল্লাহ ওয়ালাগণের উপর বিপদ-আপদ বেশী আসিয়া থাকে। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নবীগণকে সর্বাধিক মুসীবতে রাখা হয়। তারপর যাহারা উত্তম তাহাদেরকে এবং তারপর অবশিষ্টদের মধ্যে যাহারা উত্তম হয় তাহাদেরকে অধিক মুসীবতে রাখা হয়। মানুষকে তাহার দ্বীনী যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। আর প্রত্যেক কষ্ট এবং মুসীবতের পর আল্লাহর অনুগ্রহে সহজ অবস্থাও লাভ হয়। ইহাও চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের বুযুর্গদের উপর কি কি অবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে। এই সবকিছুই দ্বীনের স্বার্থে ছিল। যে দ্বীন আমরা নিজ হাতে বিনষ্ট করিতেছি ঐ দ্বীনের প্রসারের জন্য তাঁহারা ক্ষুধার্ত থাকিয়াছেন, গাছের পাতা চিবাইয়াছেন, রক্ত দিয়াছেন। এই সব কিছুর বিনিময়ে দ্বীন প্রচার করিয়াছেন। অথচ আজ আমরা উহা টিকাইয়াও রাখিতে পারিতেছি না।